ক্রান্তক

ক্রান্তিক

মাসিক সাহিত্য সঙ্কলন

২৫ বর্ষ, আগস্ট ১৯৯৮

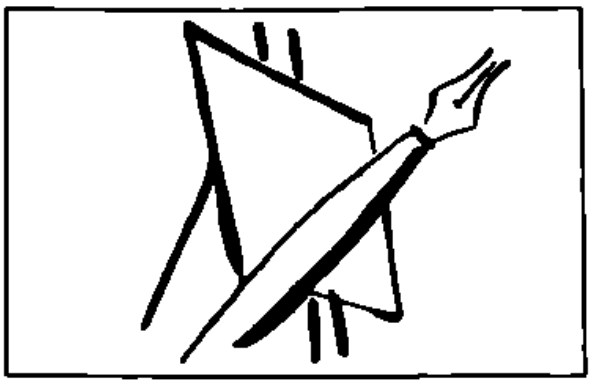

নিরক্ষরী কবি ও মূকাভিনয় কবি

ওলন্দাজ কবিতা ছিল সত্যানুসন্ধান। পাশ্চাত্য শাসন পদ্ধতির প্রক্রিয়াকরণের কাঠামোর পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কবিতার ঘরোয়ারূপটির ও পরিবর্তন ঘটেছে। কথা ও বিম্ব কবিতার আধিক্য পরিষ্ট হচ্ছে মূর্তোয়া কবিতা ও বিমূর্ত কবিতা। রবীন্দ্রনাথের ডীকলপোর্ট ও তাঁর প্রয়াণের পর এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তার তত্ত্ব তল্লাশ এই প্রবন্ধে করেছেন রাসবিহারী দত্ত।

আমার দৃষ্টিতে রুশিয়ার চিঠি

রাশিয়ার চিঠিকে ঘিরে আজও বিতর্ক বিদগ্ধজনের মধ্যে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী ও তার সফল রূপায়ণ যেমন তাঁর চোখে বড় করে দেখা দিয়েছিল, তেমনি তার দুর্বলতর দিক তাঁর কবিমানসের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক পূর্বোক্তবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

২ ● প্রবন্ধ ঃ দুর্বোধ্য কবি ● কবিতা ● রাসবিহারী দত্ত
৮ ● প্রবন্ধ ঃ আমার দৃষ্টিতে রুশিয়ার চিঠি ● সুধাদেবী
১২ ● ফিচার ঃ নারায়ন 'শিল্পী' রবীন্দ্রনাথ ● প্রত্যুষ নন্দী
১৪ ● প্রবন্ধ ঃ নষ্টালজিয়া ও ইউটোপিয়া ● অরুণ সরকার
১৬ ● কবিতা
১৯ ● স্মরণ ঃ বন্ধুর দেশ দেবব্রত ● অজিতকুমার বসু
২২ ● ধারাবাহিক ঃ অপারেশন থ্রীন ● দীনেশ চট্টোপাধ্যায়
২৮ ● গল্প ঃ দুই পৃথিবী ● অরুণ সরকার
৩১ ● রাজলক্ষ্মী ● ঈশা ঘোষ
৩৪ ● স্মরণ ঃ কৃত্তিবাস ● অশোক ভট্টাচার্য
৪০ ● শিল্প সংস্কৃতি ঃ বিশ্বের সংস্কৃতির অন্য ধারা ● সুব্রত রুদ্রচরণ
৪২ ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
● ডি. জিয়ানজিন

প্রচ্ছদ ▫ অরে লালভস্ম
অলঙ্করণ ▫ অনি সরকার, শ্রীদীপ মল, পার্থ মৈত্র

সম্পাদক ▫ রাসবিহারী দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক ▫ অরুণ মুখোপাধ্যায়

সুধিজন নিবেদন

মার্চ সংখ্যা থেকে জুলাই পর্যন্ত বহুবিধ বিপর্যয়ের ফলে ক্রান্তিক নিয়মিত প্রকাশ করা যায় নি। গ্রাহকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের প্রাপ্য বারটা সংখ্যাই পাবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—কর্মাধ্যক্ষ

প্রতিটি ফ্লাট থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী ৯৮ সম্পাদিত ও মুদ্রিত ও বিক্রয় কেন্দ্রাধীন ক্রান্তিক কার্যালয়, বি-৩১, ফ্লাট-৫, বিধান মার্কেট স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত।

Kranti is published from Kranti group of publications for an annual subscription Rs. 120 by registered post and by hand delivery Rs. 100 Kranti Publications

Kranti-31 Block-5 Bandhan Complex B. Calcutta-700 031 Ph 551-4007

SPACE
DONATED
BY

Glaxo Calcutta Employees' Co-operative Credit Society Limited

50, Hide Road, Calcutta-700 088

(Regd. No. 96/Cal of 1964)

With best compliments from :

SEARCHERS (INDIA)

Phase : II / E - 83A, Industrial Area
Bokaro Steel City - 827014

BST BK - (R) Dt. 16-1-85 06542-40014 (O)
CST BK-1125 (C) Dt. 6-9-85 Ph 91-06542-40471 Fax (R)
06542-48475 (Works)

With best compliments from :

Kharagpur Metal Reforming Industries Pvt. Ltd

Manufacturers of :
S. G. Iron, Greaded Cast Iron, Plain Carbon & Alloy Steel, Casting Specialist. Mechanical Spares & Components.

Koushallya, Kharagpur-721 301

City Office : Hind Apartment (3rd Floor)
545, G. T. Road (South), Howrah-711101
Gram : Manjyoty Kharagpur

Phone : City Office : 660-1651, 660-1283
Works : HWH-660-1614
Works : KGP-03222-55340
Fax : Office : 033-660-2452,
Works : 03222-55376

With best compliments from :

SEARCHERS (INDIA)

72, Co-operative Colony
Bokaro Steel City - 827001
Dist - Bokaro

Phone : (06542) 40014 (O), 40471 (R)

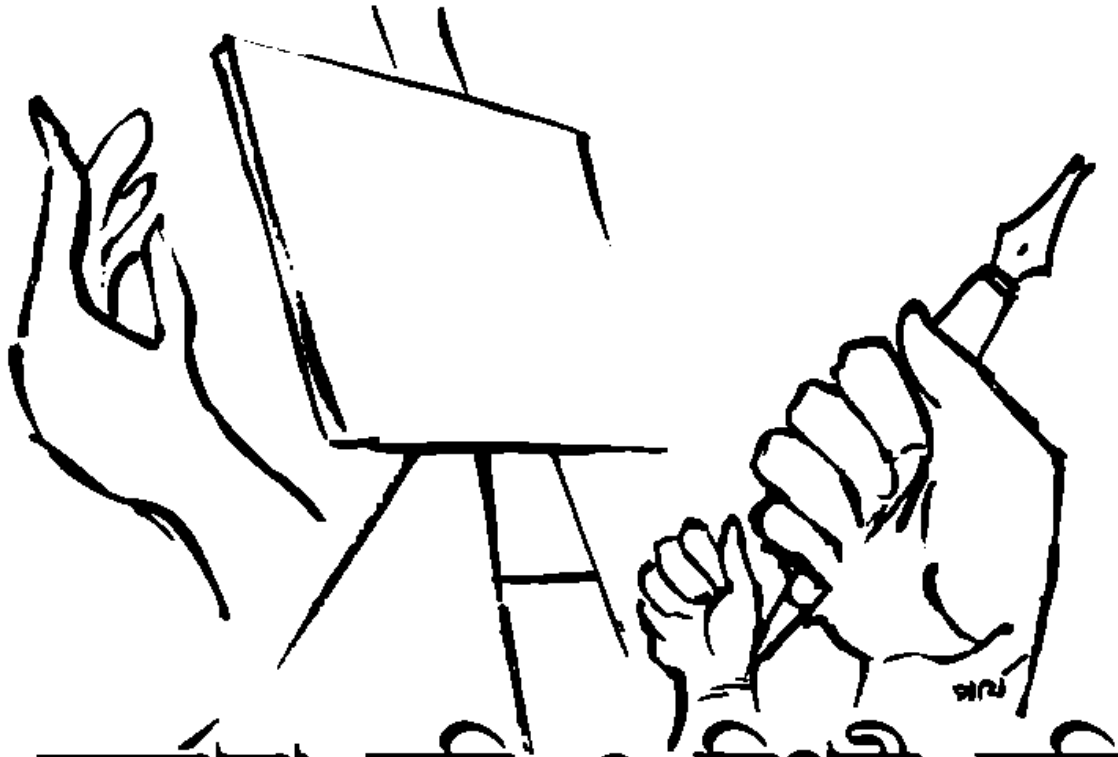

বুর্জোয়া কবি ও বিপ্লবী কবি

রাসবিহারী দত্ত

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, একদিন সমাজ বেঁধেছিল মানব জীবনকে পূর্ণতর ও অধিকতর আনন্দময় করবার জন্য। সেই সামাজিক বন্ধন আজ বন্ধনী হয়ে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করে চলেছে। তার আর্তনাদ দিকে দিকে। এই বেরবার জীবন, এক চলমান যন্ত্রণা। এত জটিল তার গতিপ্রকৃতি, এত অফুরন্ত তার সৃষ্টি সম্ভার যে যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ সেই রস সমৃদ্ধি নিঃশেষ করতে পারে নি। এই রসবস্তুর নব নব বিকাশ যে স্রষ্টা আবিষ্কার করতে পারেন তিনি সার্থক স্রষ্টা, শিল্পী। এইভাবে প্রতি মুহূর্তের নব নব সৃষ্টিতে যে মানব সমাজ নবজন্ম লাভ করছে তার গভীর অনুধ্যান অন্বেষণ এবং ক্রান্তিকারী বিশ্লেষণই প্রগতি সাহিত্য, শিল্প। আর এই প্রগতি সাহিত্য শিল্প যখন মানবতার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় নৈমিত্তিক ক্ষোভ বিক্ষোভ, বিদ্রোহ সংগ্রামকে সংগঠিত বৈপ্লবিক রূপান্তরের স্ফুরিত নবজীবনের নব যুগের নতুন প্রাণের পরিচয় তুলে ধরে তখন তা হয়ে ওঠে বিপ্লবী কবি, বিপ্লবী শিল্পী ইত্যাদি।

এর বিপরীতে যা গতানুগতিক যা কেবলমাত্র অতীত রোমন্থন, যার ভেতর নিজস্বতা বা নতুন কিছু না থাকে শুধু পুরনোকে টিকিয়ে রাখার নিত্য নতুন কৌশল তা হলো বুর্জোয়া সাহিত্য। প্রকৃতিকে মন্থন করে মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘটিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সেই সম্পর্কে অধিকার নিয়ে যারা ধনীদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার উপায় সর্বস্ব রচনায় কূট প্রয়াস উপহার দিচ্ছে তারাই হলো বুর্জোয়া সাহিত্যিক, বুর্জোয়া কবি বা বুর্জোয়া শিল্পী।

মানব সমাজ প্রগতিশীল। কিন্তু এই সমাজ প্রগতিকে যারা চলতি সংস্কারের মোড়কে মলরঙ্গে ঢাকিয়া সর্বস্ব করে উপস্থিত করে তারা স্থানু। তাদের সাহিত্য যতই উচ্চতর আঙ্গিকতার কারু কুশলতা সর্বস্বই হোন না কেন তা ক্ষণচমক ও ক্ষণ উল্লাস মাত্র হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রচার ও প্রসারের চক্র নিনাদে তাদের কৌলিন্য সর্বত্র হয় অবশ্যই। কিন্তু তা সাহিত্যরস ভূয়িষ্ঠ বুর্জোয়া সাহিত্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম ও সুমহান কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক ও প্রসাদ। কিন্তু সেই কবিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ সম্পদ রবীন্দ্রনাথকে কুলীন করতে কিছু আধুনিক সাহিত্যসেবী আধুনিককাল থেকে খারিজ করতে চান তাঁদের গায়ে কাজল কৌলিন্য সাহিত্যিক

অবশ্য, বহুল প্রচারিত সাংবাদ সাহিত্য মাধ্যমের সিংহাসনে আসীন এই সব মূঢ় কলমচীয়েরা অনায়াসে বঙ্কিমচন্দ্রকে তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আখ্যা দেন। রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠীন জীবনকে নিয়ে রগরগে রচনায় ছোট করার মুলিয়ানা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কোন চিরকালীন আবেদন নেই। এক বহুল প্রচারিত সাংবাদিক তো বিকৃত ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে চলেছেন।

এখন প্রশ্ন হঠাৎ এই বুর্জোয়া শিবির কেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিকৃত রুচির ফ্লস রচনা পরিবেশন করতে উঠে পড়ে লেগেছে? তা কি এই জন্যই যে গঙ্গোত্রীর বুকে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত বামপন্থী সরকার সংসদের দশকের অন্ধকার যুগের বাতিল রবীন্দ্রনাথকে নব মূল্যায়নে চর্চা শুরু করার কথাবার্তা? আজ পঞ্চায়েতের কল্যাণে বাংলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রচর্চা প্রসারিত। অতি দূরদূরান্তের চালাঘরে বসে কিশোর আজ রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছে। সংগঠিত উদ্যোগে ক্লাবে, সংঘে, পাঠাগারে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আলোচনা সভা, বিতর্ক গান, নাটক, গৌতুকনায় কলতরে জতরে মনুষ উপস্থিত হচ্ছে। এই জন্যই কি ঔপনিবেশিক ধারা ভিতের এই তর্জন গর্জন। একথা বুঝতে আজ আর অসুবিধে নেই।

অথচ ইতিহাসের কি অমোঘ শিক্ষা। সুশিক্ষক সময় তর্জনী উঁচিয়ে জানিয়ে দেয়, 'এ হেন রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে আমরা ভুল করে ফেলেছিলাম। রাজনৈতিক লাইন স্থির করার ভ্রান্তির সঙ্গে জড়িয়েছিল সেই ভ্রান্ত রবীন্দ্র দর্শনের ঘটনা। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আমাদের কোন কোন নেতা রবীন্দ্রনাথের অন্য সব অবদান ভুলে গিয়ে তাঁকে কেবল "বুর্জোয়া কবি" বলেই বর্ণনা করে ফেলেছিলেন। সে কথা বলে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন তাঁরা। অবশ্য বছর তিনেকের মধ্যে রাজনৈতিক লাইন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই বক্তব্যও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। আমরা আগেও জানতাম, মাঝের এই পর্বটা বাদ দিলে এখনও জানি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমাদের নেবার মতো অনেক কিছু সম্পদই রয়েছে। সেই তুলনায় তাঁর বিরূপ সমালোচনা করার বিষয়বস্তু অতি সামান্য। তাঁর মনের দরজা ছিল হাট করে খোলা। দেশ-বিদেশ যখন যেখানে তিনি গেছেন সেখান থেকেই সংগ্রহ করে এনেছেন প্রগতির পথ নির্দেশ। মানুষের বিরুদ্ধে মনুষের অধিকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কলম অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।—এই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী সমস্ত প্রগতির আন্দোলন আজও অসীম প্রেরণা পায় (সরোজ মুখার্জি—মার্কসবাদীর চোখে রবীন্দ্রনাথ)।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি হিসেবে চিহ্নিত করে কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা তৎকালীন প্রগতি সাহিত্যপত্রের পাতায় বিতর্কের পর বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন। উৎসাহিত প্রতিপক্ষ শিবির এই নিয়ে বেশ জলঘোলা করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে প্রগতি লেখক সংঘের কর্ম চাঞ্চল্যে কিঞ্চিৎ ভাটার টান পড়েছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথকে এখন সরাসরি আক্রমণ অনেক বাঙালি সাহিত্য মানসকে তীব্রভাবে পীড়িত করেছিল। কারণ সেই বিতর্কের ভাষা ছিল খুবই কঠোর। "ভারতে মার্কসবাদী শিবিরের সঙ্কট এইখানে যে মার্কসবাদীগণ এ বিষয়ে সচেতন নন। তাঁরা প্রগতির শিবিরকে রাবীন্দ্রিক মোহে আচ্ছন্ন রেখে শত্রুপক্ষের যাদু বিস্তারে সাহায্য করেছেন, তাঁর আদর্শকে আক্রমণ করতে পারছেন না, কারণ সে আঘাত নিতান্ত অনিবার্যভাবেই রবীন্দ্রনাথের গায়ে এসে লাগে। রবীন্দ্রদর্শনই ভারতীয় শাসক শ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্র দর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে প্রগতির শিবিরে তার স্থান হতে পারে না। রবীন্দ্র সাহিত্য হোল প্রগতির শিবির থেকে মানুষ ভুলিয়ে বের করে নিয়ে যাবার মোহিনী মায়া। অর্থাৎ উপনিবেশের মায়াবাদ হোল রবীন্দ্রদর্শনের মূলমর্ম। এই দর্শনই শ্রেণী সংগ্রামের বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার। মজুর শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রাম ভুলিয়ে দেবার মতো এতো বড় শক্তিশালী হাতিয়ার ধনিক শ্রেণীও আবিষ্কার করতে পারেনি। ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয় এবং তার উল্টো ধারা।"...

একথা অনস্বীকার্য রবীন্দ্র পরিমণ্ডল উপনিষদের মায়াবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। রামমোহন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত মায়াবাদ সর্বস্ব ভাববাদী দর্শনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার শাসক সমাজের পক্ষ থেকে এক উদগ্র আন্দোলন। কারণ পৌত্তলিকতা সর্বস্ব গৌড়পাদের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের প্রভাব সমাজে ক্রমশই ফিকে হয়ে যাচ্ছিল। শূদ্র সমাজ দ্রুত মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে নানক, কবীর, চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রভাব মুক্ত কোনভাবেই নয়। তাঁর বহুল প্রচারিত 'ধূলামন্দির', 'প্রশ্ন' কবিতা তারই উজ্জ্বল নির্দশন। যা বিবেকানন্দের সেই বহুল প্রচারিত বাণী। 'জীবে প্রেম করেন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ টাটা বিড়লার জীব প্রেম ও পাঁচু মণ্ডল, শেখ নাসের, মধু মাহাতোর জীবপ্রেম ঈশ্বর সেবা তুল্যমূল্য করে দেখানো হয়েছে। মায়াবাদের মোহিনীমায়া প্রভাবিত করার পক্ষে এসবই যথেষ্ট। কারণ টাটা-বিড়লা মন্দির-মসজিদ-গীর্জা গড়তে সাহায্য করছে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। ব্যবসার ঊর্ধ্বক্ষেত্রে তো ঐসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এভাবে আক্রমণ করে নঞর্থক দিককে একমাত্র প্রাধান্য দেওয়ার হঠকারিতা লেনিনের কোন কোন কমিউনিস্ট নেতা করেছিলেন। তাঁদের চোখের সামনে মার্কস এঙ্গেলসের বালজাককে নিয়ে আলোচনা ও লেনিনের টলস্টয়কে পর্যালোচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও। বংশ ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যক্তির জীবনে অনেকখানি হলেও দেখার বিষয় তা তা হলো ব্যক্তি বংশগতি ও পরিবেশের কাছে নিজেকে বন্ধক দিয়েছে কি না তার উপর। একধারে শোষিত পরিবারে ও পরিবেশে জন্ম নিয়েও কেন কেউ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে। আবার উল্টোটিও ঘটে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাইই ঘটেছে। তাঁর জীবন বিকাশের প্রতিটি মুহূর্তে ক্রমোত্তরণের ধারা প্রবাহিত।

জীবনের সূচনাদণ্ড থেকে পীরালী অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণ হওয়ার তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পুরীর মন্দিরে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে ওঠে।

যে মোর দুর্ভাগ্য দেশ, যাদের করেছে অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ক্ষণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
অপমানিত, দীতাঞ্জলী।

মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষিত হয়েছে 'জাতির অহঙ্কারে' কবিতায়, পত্রপুট ১৫ সংখ্যক কবিতায়।

আমি ত্রাতা, আমি মন্ত্রহীন
দেবতার কণ্ঠীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পারাপার হতে
আমি ত্রাতা, আমি জাতিস্মরা।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম যে ক্ষুরধার তার নজির ভারততীর্থ কবিতা। অতীত ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে তাঁর অনবদ্য উচ্চারণ।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ। এসো এসো খ্রীস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।

তিনি তাঁর নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতার কথা কণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। উত্তরণের জায়গান গেয়েছেন প্রতিটি মুহূর্তে। তিনি কি করে বুর্জোয়া কবি হিসেবে আখ্যাত হতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ তো কোনভাবেই স্থানু নন। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে চলতি সংস্কারের বিরোধিতা করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় তৎপর থেকেছেন। কেবল যে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করেছেন তা তো নয়। প্রগতিকামী কবি সাহিত্যিকের মতোই শুধু যে চলতি সংস্কার ভেঙেছেন শুধু তাই নয়, তিনি সংস্কার ভেঙে নতুন আদর্শের অনুকূল সংস্কার গড়ে তুলেছেন। তিনি মানবতাকে আশঙ্কিত কালের মুখ থেকে রক্ষা করতে সংহতি ও দুর্বার প্রতিরোধের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ডাক দিয়ে বলেছেন, যাদের বাহুতে বল আছে, যাদের চিত্ত ভয়শূন্য, যাঁরা ধী শক্তিতে উজ্জ্বল যাঁদের লেখনিতে আছে তরোয়ালের ধার তাঁদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

যদিও সেই সব স্থানু আধুনিক বুর্জোয়া কবিরা ক্যাশন কৌলিন্যের দৌলতে বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট মারছেন, বা কারোর মহত্ত্বায় আর গতানুগতিকতার ধারায় আশীকের কবিকুরীতে অন্তর্লীন জীবনের ক্লেদকে রসেবশে রগরগ করে পরিবেশন করছেন। সেই সব কবিদেরই এখন চক্ষুশূল হলেন রবীন্দ্রনাথ কেন না, রবীন্দ্রনাথ এই সব কবিদের উদ্দেশ্যে কোন আহ্বান ধ্বনি রেখে যাননি। বরং এদের প্রতি অবজ্ঞায় নবজীবনের কবির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন তাঁর ঐকতান কবিতায়।

কৃষাণের জীবনের শরিক যেজন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী শুনি কান পেতে আমি।
কিংবা
মুক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো তুমি।
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী কেন শুনি।

আর এই চর্বিত চর্বন ও অতীতের রমন্থনরত মার্কা বুর্জোয়া কবিদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি কেন ক্ষুরধার।

আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নাইই আছেন, আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের বালক্ক আমি তো পাই কুমুদ
আমার কালের কর্ণমাত্র পান নি মহাকবি।

অথচ রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের মতো উর্বশীকে বিষয় করেছেন এমনকি আধুনিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সেই অতীতকালের সমস্ত সুরভীই আত্মস্যাৎ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন নি। কেবলমাত্র অতীতের রোমন্থন সর্বস্ব কবিতা যদি রবীন্দ্রনাথ লিখতেন তো উর্বশীর আধুনিক রূপ কল্পনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। আধুনিক সমালোচক নীরেন্দ্রনাথের ভাষায় "আমাদের দেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্তন না হইলে উর্বশীর এই নবরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইত না।"

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর ক্রমোত্তরণ প্রগতির পথে যাত্রা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি যথার্থ অর্থেই প্রগতিশীল কবি। মানব সমাজ প্রগতিশীল। সেই মানব সমাজে ক্রমোত্তরিত প্রগতির রসরূপ তাঁর কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের সংঘাতে যে জীবন নতুন নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর কুটিরে তুলছে সেই মুকুরিত নব জীবনের গানের উর্বর্তনই তাঁর কাব্যের বিষয়। শুরু থেকে শেষের বিচারে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি নয়, তিনি নবজীবনের রসরূপ স্রষ্টা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহান প্রগতির অগ্রদূত।

অথচ রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে সুকান্তের কবিতা উত্তরসূরীর যে যোগ্য ভূমিকায় সমুজ্জ্বল সেই কাব্য প্রবাহ কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কিছুটা বিড়ম্বনাগ্রস্ত। ভারতে শাসক শ্রেণীর উত্তরোত্তর সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং দুর্বল নড়বড়ে বিকৃত গণতন্ত্রের উপহার দেওয়ায় এতদিনের ঐতিহ্যময় সাহিত্য সংস্কৃতি ও চোরাবালির শিকার হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে চল্লিশ দশকের বহু প্রচারিত বাংলা সাহিত্য আজ স্থানু অতীতের ক্লেদ কালিমার রগরগে অনুবর্তন ভিন্ন কিছুই নয়। অন্যদিকে প্রগতির কবিতা ও কবি বিদ্রূপী ভূমিকায় কবিতা চর্চায় রত হওয়া সত্ত্বেও প্রচার-প্রসারের অভাবে ও নেতৃত্বের অবজ্ঞায় শীর্ণ স্রোতে হলেও শিবির জিইয়ে রাখার অনির্বাণ প্রচেষ্টায় রত, আর বুর্জোয়া কবি ও কবিতার দাপটের কাছে এস্টাব্লিশমেন্টের মদতের কাছে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকের অভাবে ক্ষীণতনু , ছন্দ ধীর লয়ে শম্বুক গতিতেই হোক না কেন দৃঢ় দৃপ্ত তাদের পদক্ষেপ।

আমার দৃষ্টিতে 'রাশিয়ার চিঠি'

সূর্য সারথি

স্বাস্থ্যের কারণে দুবারই (১৯২৬ ও ১৯২৯ সাল) রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনের সরকারি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। অবশেষে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে কবি যাত্রা করলেন। পনেরদিনের অবস্থানকালে (১১-২৫ সেপ্টেম্বর) রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধনে যে মহান ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন তার নিখুঁত মননবন্ধ বর্ণনার ফলশ্রুতি হল এই অসামান্য সৃষ্টি, 'রাশিয়ার চিঠি'।

১৯৫২ সালে, অক্টোবরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফে এক প্রতিনিধি দল সোভিয়েত দেশে যান। স্বদেশে ফিরে তাঁরা পার্টির মুখপত্র, 'New Age'-এ সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এক পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। খুব সম্ভবতঃ এই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, 'Go to Russia if you want to visit Heaven.'

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে কৃষির বৈপ্লবিক রূপান্তর, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পশক্তি রূপে রাশিয়ার আবির্ভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রিক সমান্তরাল বিশ্ব-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন ইত্যাদি বিস্ময়কর সাফল্যে অভিভূত প্রতিনিধিদলের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ হয়তো কোন বাধা মানেনি। তাই তাঁরা রাশিয়া দর্শনকে স্বর্গ দর্শনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে ফেলেছেন। স্বর্গের অস্তিত্ব বা বাস্তবতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তাঁদের মনে জাগেনি।

অপরদিকে, দু'দশকেরও বেশি পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়া দর্শনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'রাশিয়ায় না এলে এ জন্মে তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকত।' আবেগকে প্রশ্রয় মর্যাদা দিয়ে কবি যে বস্তুনিষ্ঠ তুলনা উপস্থিত করেছেন তা যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য, তেমনি বিশ্বাসযোগ্য। তীর্থ তো অলীক কিছু নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতারই অঙ্গ।

দুঃখী-দেশে লালিত অতি দুর্বল আশা নিয়েই কবি রাশিয়া যাত্রা করেছিলেন। গিয়ে যা দেখেছেন তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে। 'অধিকাংশে মানুষকে ভলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা 'সনুচ্চ থাকবে'—এরা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। রাশিয়ায় 'একবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।' এদের বিশ্বাস, 'সকল সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা।'

শিক্ষা ঃ

এতকাল সমাজের অধিকাংশে লোক ছিল শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেই শিক্ষা এক 'আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে', তা বিস্ময় জাগায়। বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার চালিকা-শক্তি হচ্ছে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি ও আত্মোৎসর্গ।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শিক্ষা বিস্তারে যে উন্নতি লাভ হয়েছে দেড়শো বছরেও ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা 'বন্যার মত বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে।' বিজ্ঞানের শেষ ফসল পর্যন্ত এদের হাতে পৌঁছে দেবার সবরূপ প্রয়াসে রয়েছে। এরা জানে 'শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার সুফলতায়।' শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠনে এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা হচ্ছে, 'জনসাধারণকে এরা ভদ্র সাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা আরাম জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ঢের পরিমাণে।

এদের মতে, 'অশক্ত-কে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্তই এরই উপরে নির্ভর করে।'

শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। নানা প্রকার মুজিয়ামের জালে এরা গ্রাম-শহরকে জড়িয়ে ফেলছে।

সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়...। এরা 'বিশ্বকর্মা'।

কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ যারা ভারতের জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল, সোভিয়েত শাসনে এই জাতীর লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার এক উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সবই আছে। অর্থাৎ 'আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্য শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।'

আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।

কলাসাধনা

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নতুন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে,

এখনো থামেনি। এখানকার সমাজ বিপ্লবে এই নতুন সৃষ্টিরই অসম সাহস কাজ করেছে। এরা সমাজে, রাষ্ট্রে, কলাতত্ত্বে--কোথাও নতুনকে ভয় করেনি।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিপুল অগ্রগতি, ব্যাপক যৌথিকৃত কৃষি, নিরক্ষরতার অবসান, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সাধারণভাবে সোভিয়েত দেশের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান, ýïðîôåññîð ê ñòàðèêó(Petrov) কবির কাছে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ধনস্রোতের গতি ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি মানুষ অভিমুখী ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।'

সোভিয়েতের সার্বিক সাফল্যের চাবিকাঠিটি এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরা দার্শনিক কবির পক্ষেই সম্ভব। মার্কসবাদী সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেও কি এর চেয়ে সম্পূর্ণতর ব্যাখ্যা মিলবে?

স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে যাতে কেউ অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, সেদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রয়েছে।

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েত স্বাস্থ্যনিবাসে বিনা ব্যয়ে থাকতে পারে। এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (Sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। যার মধ্যে—য়ুরোপীয় আদর্শ অনুসারে যাদের অসুস্থ বলা হয়ে থাকে তারাও আছে।

কৃষি

রাশিয়ার সমস্ত ছোট বড়ো শহরে এবং গ্রামে কৃষিভবন ছড়ানো আছে। এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। জরা নিরক্ষর তাদের পড়াশোনা শেখার উপায় আছে; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক প্রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মুজিয়ম, তাছাড়া চাষীদের সকল প্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পত্রাবলী দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

'এই বহু ব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েত সরকার এককালের নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।'

শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র; এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধন করেছে।'

'সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্ত্ব এরা সৃষ্টি করতে লেগে রাশিয়ায় একটা নতুন সমাজ, বিরল সভ্যতা গড়ে তোলার সাধনা চলছে, এ হচ্ছে লেখকের উপলব্ধি। তাঁর কথায়, 'যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ।'

এই মহান যজ্ঞের যে বিরুদ্ধলি দ্রষ্টা-কবির উপলব্ধির ভিত্তি তা সংক্ষেপে উল্লেখের দাবি রাখে :

ক) শিক্ষা আশ্চর্য উদ্যমে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে।

খ) সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি তাদের (কৃষি ও কর্মীদের দলের) চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ।

গ) এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে।

ঘ) লখনলে লসে যেটা সবচেয়ে আনার ভালো লেগেছে সে হচ্ছে জনপরিষার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।

ঙ) এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।

চ) এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্বার।

ছ) আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে।

জ) অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।

ঝ) আজ পৃথিবীতে অন্তত একটা দেশের লোক রাজাতিক স্বার্থের কথা চিন্তা করেছে। এই হচ্ছে কবির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, গভীর উপলব্ধি, আন্তরিক আবেগ ভালবাসার রাশিয়া।

প্রসঙ্গত, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রাশিয়ার বিকাশমান সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণে অনুসৃত নীতি পদ্ধতি পদক্ষেপ, কোন কিছুই কবি-দার্শনিক-এর নির্বিচার সমর্থন লাভ করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমর্থন জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সতর্কবাণী

শিক্ষাবিধি সংক্রান্ত প্রশ্ন :

১) 'শিক্ষাবিধি নিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে-কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না। সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলবার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, বিদ্যা হবে পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

২) 'ঐকান্তিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি নিষিদ্ধ দেওয়ার প্রশ্ন :
(এ সম্পর্কে) অসম্মতির কারণ মানব চরিত্রের মধ্যে। নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটি উপায়।'

'এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছড়িয়ে যাওয়া চাই। তাহলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।'

'সোভিয়েতরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্য জবরদস্তির সীমা নেই।'

আমি ও পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোন একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানব-চরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেঁধে

যায়।'

ব্যষ্টি-সমষ্টি সম্পর্কের প্রশ্ন ঃ

৩) 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে—বোধ হয় না। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কেন বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয়তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।'

'এখানে জবরদস্তি লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভাল ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্ত মতো নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।'

'মনকে একদিকে স্বাধীন করে (ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজ প্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্য এরা প্রবল চেষ্টা করছে) অন্যদিকে স্থূলমনের বল করা সহজ নয়। জবরের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।'

৪) রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্রের প্রশ্ন ঃ

'একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত; যে চালক ও যারা চলিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তাছাড়া সহজে চলিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে।

এই নায়কতা শব্দের মধ্যেই থাক, তন্ত্রের মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।'

সমাজে সহযোগিতা বনাম প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ঃ

৫) 'আধুনিককালে ব্যক্তিগত ধনলাভের দিকে যে প্রবল শক্তির অধিকার গিয়ে তাতে সর্বজনের সম্পদ ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লাভ, অপর পক্ষে গভীর দৈন্য, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড় হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের একশ্রেণীর সঙ্গে অন্যশ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের।'

'বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়।'

'মানব সমাজের সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠেছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতি প্রস্তাব উঠেছে।'

'সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা মানুষ চিরদিন সইবে না।'

অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার প্রশ্ন ঃ

৬) 'সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসবাদী অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুস্পষ্ট; সেই জেরের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'যেখানে আশু ফল লাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না।'

'রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা, অন্তরে বাহিরে শত্রু। এখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্য চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকর্মের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এ জন্য বল প্রয়োগ করতে ওদের কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু পরমত যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না।'

কিছু কথা

ক) নভেম্বর বিপ্লবের পর লেনিন রাশিয়ায় যে গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন তা ছিল নজিরবিহীন। এই গণতন্ত্রেই মানুষ শোষণ-মুক্তির প্রকৃত পথ পেল। এখন কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আবাসনের অধিকার, স্বীকৃতি লাভ করল। এর আগে কোন গণতন্ত্রই এসব মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দিতে পারেনি। তাই লেনিনের দাবি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' ঢের বেশি গণতান্ত্রিক। তাঁর মতে, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'-এর মর্মবস্তু হচ্ছে তা কেবলমাত্র, বা, এমনকি প্রধানত-ও বল প্রয়োগের (শোষকদের বিরুদ্ধে) মধ্যে নিহত নয়, মর্মবস্তু নিহিত আছে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় এবং তাকে সম্পূর্ণতা দানে। স্পষ্টতই, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'-এর ভূমিকা অপরিহার্য।'

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যেখানে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত রয়েছে, যেখানে 'জনগণের ভাগ্য' এক বা অভিন্ন হতে পারে না, সেখানে তাদের 'সম্মিলিত ইচ্ছা'র কোন ভূমিকা থাকে কি।'

তবে একথা অনস্বীকার্য, যদি 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র'-এর বিকৃতি ঘটে এবং তা শেষ পর্যন্ত কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয় তা অবশ্যই মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এক 'উপদ্রব' হিসেবে দেখা দিতে পারে।

খ) পুঁজিবাদী সমাজ ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা, ইত্যাদির অনিবার্য প্রতিক্রিয়া রূপে বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়, কবির এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। তবে বলশেভিকবাদ সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদানও সমর্থন দান করবে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপে, এটা মেনে নিতে বাধে।

গ) রবীন্দ্রনাথ সমাজে সামঞ্জস্য রক্ষার স্বার্থে ব্যষ্টি-সমষ্টি বিরোধের স্থায়ী সমাধান চেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কস তাঁর কল্পিত আদর্শ, সাম্যবাদী সমাজ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, '...এখানে মানুষ-মানুষ, মানুষ প্রকৃতি, ব্যক্তি প্রজাতি...ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় বিরোধের অবসান ঘটবে।'

'(এখানে) ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সকলের স্বাধীন বিকাশের পূর্বশর্ত।'

স্পষ্টতই, ব্যষ্টি সমষ্টি সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের এই অবস্থানে রবীন্দ্র বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

ঘ) নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সরকারের ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতি, 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি', সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহের রণনীতি, ইত্যাদি সবই দীর্ঘ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি। তবে, ১৯১৮ সালে গৃহীত 'গৃহযুদ্ধকালীন সাম্যবাদ'-এর নীতি, এবং যৌথ খামার আন্দোলন' সংগঠনে অনুসৃত নীতি, কোনটিই সমাজের ব্যাপক জনসংখ্যার তেমন অনুমোদন বা সমর্থন পায়নি। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণই এবং জটিল পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় এই নীতি দুটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। দুটিকেই ঐতিহাসিক অনিবার্য রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বল প্রয়োগ যখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটে তাকে নিন্দা করা যায় না। তা তো সমাজের আত্মরক্ষার তাগিদেই। 'গৃহযুদ্ধকালীন সাম্যবাদ'-এর নীতির সমর্থনে লেনিনের উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক : 'War Communism was not a normal economic policy. It was thrust upon us by war and ruin.'

গৃহযুদ্ধ ও নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে আপৎকালীন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ (বল প্রয়োগ নীতি গ্রহণ) ছিল এক 'অবাঞ্ছিত' বাধ্যবাধকতা।

ঙ) (১) 'শিক্ষাবিধি নিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না।'

(২) 'নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।'

(৩) 'সত্যের জোরকে গায়ের জোর দ্বারা যত প্রবলভাবেই মেলাতে চেষ্টা করি একলা এত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।'

(৪) 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা-এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তেমন হয় না।'

কবির দার্শনিক প্রত্যয়গুলি (১—৪) তো সোভিয়েত-এর নতুন সভ্যতা নির্মাণ-প্রক্রিয়ার পথ পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সাবধানবাণী উচ্চারণ।

কবির এই সাবধানবাণীর গভীর তাৎপর্য ও অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েত নেতৃত্ব যদি অগ্রসর হতেন তাহলে হয়ত এই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় এড়ানো যেত, সারা বিশ্বে সোভিয়েত সভ্যতার বিজয় কেতন উড্ডীন হত।

বিশ্বের মানচিত্রে আজ সোভিয়েত রাশিয়া অস্তিত্বহীন। এর ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে পনেরটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই নবজাত সব রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছে, এর অবশেষটুকু পর্যন্ত নির্মূল করার অভিযান চলেছে। ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়নি, এরই মধ্যে কেন এই সর্বগ্রাসী বিপর্যয়।

এটি মার্কসবাদের ভ্রান্ত বা অপপ্রয়োগের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি, না বিকৃত অপব্যাখ্যাত মার্কসবাদ প্রয়োগের অনিবার্য পরিণতি?

বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রান্তে পণ্ডিতমহলে এই নিয়ে বিতর্কসভা, আলোচনাচক্র, বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন করছে, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ সমানে চলছে, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এই কর্মতৎপরতায় উত্তাপ যতটা সৃষ্টি হচ্ছে আলো ততটা মিলছে না। অধিকাংশে আলোচনাই দেখা যায় এক পেশে আংশিক ও অসম্পূর্ণ। জটিল, বহুমাত্রিক এই সমস্যার দু-একটা দিকে উপর আলোকপাতকেই সার্বিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলে দাবি করা হয়।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯৩০ সালে 'রাশিয়ার চিঠি'-তেই প্রথম সত্যজাত 'সোভিয়েত সভ্যতা'-র অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এর সম্ভাব্য স্বরূপও নির্দেশ করা হয়েছিল। রাশিয়ার একটা নতুন জগৎ গড়ে তোলার ঐতিহাসিক যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত, আনন্দিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই শিশু-সভ্যতার ভবিষ্যৎ সঙ্কট ও বিপর্যয় সম্পর্কে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ছয় দশকের মধ্যেই, ১৯৯০ সালে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হল। অসাধারণ ভবিষ্যৎবাণী। A prophetic prediction.

রবীন্দ্রনাথ বিপদের যেসব কারণ নির্দেশ করেছেন তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এই বিপদের বীজ নিহিত ছিল এই বিকাশমান সভ্যতার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির মধ্যেই। 'রাশিয়ার চিঠি'র ষাট পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে সংক্ষেপে উচ্চারিত সতর্কবাণীসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ইঙ্গিতগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়ায় এর গভীর তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা কোন অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা এখানেই।

যাঁরা 'রাশিয়ার চিঠি'কে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে এক অবিমিশ্র প্রশংসা রূপে দাবি করেন এবং যাঁরা একে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নির্মম সমালোচনা রূপে চিহ্নিত করেন, উভয় পক্ষই সমান ভীরু। এরা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় না, বিকৃত খণ্ডিত সত্যই এদের তৃপ্ত ও তুষ্ট রাখে।

'রাশিয়ার চিঠি'-র মধ্যে সোভিয়েত সভ্যতার নিছক প্রশংসা বা সমালোচনা আবিষ্কারের প্রয়াস এর প্রতি শুধু অবিচার করাই নয়, এর মর্যাদাহানি করাও। আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড-এর গভীর বিচার বিশ্লেষণের আলোকে সোভিয়েত সভ্যতার যথার্থ মূল্যায়নই হচ্ছে 'রাশিয়ার চিঠি'। আমার দৃষ্টিতে 'রাশিয়ার চিঠি হচ্ছে এক অসাধারণ দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, এক নতুন ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা, সর্বোপরি, এক বিকাশমান সভ্যতাকে সমগ্রতায় তুলে ধরার অসামান্য প্রয়াস।

আজ দ্রষ্টা-কবি জীবিত থাকলে তাঁর এই বিস্ময়ের ভালবাসার রাশিয়ার, এই এক 'নতুন সভ্যতা'র আকস্মিক পতনে তিনি সব চাইতে বেশি বেদনাহত হতেন, তাঁর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত দেখে অবশ্যই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের আবিদ্বৃত রাশিয়া-ই আমাদের চেনা রাশিয়া—অদূর অতীতের, গৌরবের, প্রেরণার সোভিয়েত রাশিয়া।

নামায়ন 'শিল্পী' রবীন্দ্রনাথ

অজয় কুমার নন্দী

নামের প্রতি মানুষের ভালোবাসা অপরিসীম। নামই মানুষের পরিচিতির একমাত্র স্মারক। নামের বিকৃতি ঘটলে মানুষ যেমন অখুশি হয়, তেমনি ভালোবেসে কেউ নতুন নামে ডাকলে খুশি হয়। ব্যক্তিনাম বা নামকরণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়। বিপণি, বসতি, নবজাতকের নামকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অজস্র চিঠি আসতো। এ ব্যাপারে তিনি কোন প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না। মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য রচয়িতাদের গ্রন্থে স্থান, নদী, ভবন প্রভৃতির নামায়ণ সুরুচির পরিচয়বাহী। রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কৃত সাহিত্যের সেই ধারা নতুনমাত্রা লাভ করলো। ব্যক্তি বা স্থানের নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির উদ্দেশ্য আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনে বসতি বা ব্যক্তির নামকরণে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে শুধু শান্তিনিকেতন নয়, পশ্চিমবঙ্গের শহরে উপশহরে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আবাসনের নামকরণ চোখে পড়ে।

শান্তিনিকেতনের ফটকের কাছে যে ছোট বাড়িটি রয়েছে তার নাম 'দেহলী'। নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ বাড়িতে কবি বহুদিন বাস করেছেন। সেকালের আশ্রমের সীমানাতেই ছিল ঐ বাড়ি। দেহলীর সামনেই ছিল 'দ্বারিক' নামে আর একটি বাড়ি, যার অস্তিত্ব এখন নেই কিন্তু প্রাচীনদের মনে তার স্মৃতি আছে। শান্তিনিকেতনের শালবীথির প্রান্তবর্তী বাড়িটির নাম 'বীথিকা'। এই নামে রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। কাব্যটিই এখন বীথিকা ছাত্রাবাসের স্মৃতি বহন করছে। ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতিকে কেন্দ্র করেও কোন কোন বাড়ির নামকরণ করেছেন কবিগুরু। অধ্যাপকমণ্ডলীর চা-চক্রের মধ্যমণি ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ। তাঁর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বাড়িটির নাম হয় 'দিনান্তিকা'। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাচীন বাড়ির নাম 'আদিকুটির'। এই নামটিও পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় 'প্রাক্‌কুটির'। একালে শান্তিনিকেতনে বেনুবন ছিল। এই বেনুবনে ছিল বেনুকুঞ্জ। বাইরের অতিথি অভ্যাগতদের থাকার জন্য যে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল তার নাম রেখেছিলেন পান্থশালা। মহাত্মা গান্ধী প্রথমবারে এসে যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির নাম হোল 'বাসবী'।

আশ্রম হাসপাতালের বাড়ির নাম রাখা হয়েছিল 'গৈরিক'। এই নামকরণ সম্বন্ধে

করেকটি মত প্রচলিত আছে। ঐ বাড়ির পাশে একটা মাটির ঢিবি ছিল। তাকে গিরি ভেবে নিয়ে বাড়িটির নামকরণ গৈরিক। বাড়ির একপাশে ছিল লাল কাঁকরের রাস্তা। হাওয়ার্ড হাওয়ায় লাল ধুলো উড়ে গিয়ে বাড়ির সাদা দেওয়ালকে গৈরিক করে দিয়েছে তাই এটার নাম রাখা হয়েছে গৈরিক। শোনা যায়, এ বাড়িতে এক সময় বাস করতেন তিনজন কৌমার্যব্রতী অধ্যাপক। তাঁদের বাসস্থান হিসেবে বৈরাগ্যের প্রতীকরূপে এ বাড়ির নামকরণ হয় গৈরিক। কিন্তু এগুলো সবই অনুমান। রবীন্দ্রনাথ কী স্মরণে বাড়ির নাম গৈরিক রেখেছিলেন তা জানা যায়নি।

এক সময় আশ্রমের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বাড়িটির নাম ছিল 'প্রান্তিক'। এখন আশ্রমের পরিধি আরো বেড়েছে, তাই প্রান্তিক আর আক্ষরিক অর্থ বহন করে না। আশ্রমের আর এক দিগন্তে ছিল এক ডাক্তারের বাসগৃহ তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'দৈগন্তিক'। 'গুজরী' আবাসে হয়তো কোন গুজরাটী বাস করতেন। ফুলের মেলার মাঝে যে বাড়ি শোভা পাচ্ছে তারই নাম 'মালঞ্চ'। তত্ত্ববিলাসী অধ্যাপক ভেজেশচন্দ্র সেন একটি ভালগাছকে বেষ্টন করে রচনা করেছিলেন তাঁর কুটির। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল 'তালধ্বজ'। কলাভবনে প্রবেশ করলেই মনে হয় আমরা যেন কোন এক রূপলোকের যাত্রী হয়ে উঠেছি। কলাভবনের নাম ছিল 'নন্দন'। দৃষ্টিকে নন্দিত করে বলেই হয়তো এই নামকরণ। ছাত্রীদের হস্টেলের নাম হোল 'শ্রীভবন'। সমস্ত সৌন্দর্যের সম্মিলিত রূপ হোল 'শ্রী'। মেয়েরা তারই প্রতীক। তাই তাদের বাসভবনের নাম শ্রীভবন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রত্যুষবেলায় ঘুরে ফিরে যেমন বাড়িতে থাকতেন সে অঞ্চলের নাম রেখেছিলেন 'উত্তরায়ণ'। বাড়িগুলি স্থাপত্যে অনন্য, প্রত্যেকটি বাড়ি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। 'উদয়ন'-এর আকর্ষণ তার গঠন নৈপুণ্যে। 'কোনার্ক', আক্ষরিক অর্থেই 'অর্কশ্রীর্ষ'। 'শ্যামলী' মাটির বাড়ি। পথের ধারে গাছতলাতে এই মাটির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর প্রাণের আরাম খুঁজে পেতেন। গুরুদেবের বাসের জন্য উত্তরায়ণ যে শেষ বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছিল 'উদীচী'।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের বসবাসের জন্য এক জায়গায় অনেকগুলো বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। এই বসতির নাম রাখা হয়েছিল 'গুরুপল্লী' শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা থাকতেন শ্রীপল্লী'তে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বাড়িগুলির যেমন ছক করেছেন তেমনি তার ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বাইরেও তিনি বহু বাড়ির নামকরণ করেছেন। যেমন 'মহাভক্তি সদন', 'রূপবাণী' প্রেক্ষাগৃহ, 'বিরাজিনিবাস', 'আম্রপালি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ দেয় নাম।

'ভবন' শব্দটির প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তনগুলির ক্ষেত্রে তিনি এই শব্দটির যথাযথ ব্যবহার করেছেন। স্কুল স্তরকে বলা হয় পাঠভবন। কলেজ স্তরকে বলা হয় শিক্ষাভবন। সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় বিদ্যাভবন। হিন্দি ও চীনা ভাষা শিক্ষণ কেন্দ্রের নাম যথাক্রমে 'হিন্দিভবন', ও 'চীনাভবন'।

শান্তিনিকেতনের দিকে চোখ মেললে মনে হয় এটা ভারতীয় আরণ্যক ক্ষেত্র। আর শ্রীনিকেতনের দিকে তাকালে মনে হয় এটা লক্ষ্মীর আরাধনা ক্ষেত্র। 'শ্রী' শব্দটি রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কল্যাণমণ্ডিত অর্থ—সমাদরকে তিনি 'শ্রী' দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি নামের আগে যারা শ্রী ব্যবহার করতেন তাদের পছন্দ করতে বেশি। পরবর্তীকালে অনেক প্রজ্ঞাজনকে নামের আগে শ্রী ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু তরুলতা আর ফুলেরও নামকরণ করেছেন। শিরীষকে একটি বিদেশী ফুলের চারা এনে পুঁতেছিলেন আশ্রমে। সেই লতানো গাছের ছোট ছোট নীল ফুল কবিকে মুগ্ধ করেছিল। কবি তার নাম দিয়েছিলেন 'নীলমণিলতা'। কতগুলি ফুল আছে যার পাপড়ির অর্ধেক অংশ লাল অর্ধেক অংশ সাদা তাই বাংলায় এগুলোকে বলা হয় হরগৌরী। রবীন্দ্রনাথ এগুলোর নাম দিয়েছিলেন 'মধুমঞ্জরী'। বনপুলক, বনজুঁই, হিমঝুরি প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম। প্রবল রিক্তা বনে রক্তিম এক ধরনের ফুলকে বলেছেন 'রক্তমুখী'। কাঁটাগরির নাম বদলে রেখেছিলেন 'মহাশ্বেতা'।

রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছলে অনেকের উদ্ভট নামকরণ করতেন। পুরাতন ভৃত্য বনমালীকে নীলমণি বলে ডাকতেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে সম্বোধন করতেন বই-বাদিক বলে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে দুই নামে ডাকতেন। টাক মাথার জন্য বলতে 'বলভূষিত'। আর মাড়োয়ারিদের সঙ্গে মিলতেন বলে তার নাম দিয়েছিলেন 'সুবোরিয়া'। তাঁর সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তীকে বলতেন 'ফরেন মিনিস্টার'। রবীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীকে বলতেন নাতনী আর দৌহিত্রী নন্দিতাকে বলতেন বৃদ্ধা। রাণী মহলানবিশ ও রাণী চন্দকে যথাক্রমে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বলে ডাকতেন। আবার কখনো প্রথমা দ্বিতীয়া না বলে 'হয়রাণী' এবং 'নয়রাণী' বলে ডাকতেন। মৈত্রেয়ীদেবী মংপুতে থাকতেন বলে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'মাংপরী'। অক্ষয় চৌধুরীর পত্নী লাহোরবাসিনী শরৎকুমারীকে বলতেন 'লাহোরিণী'। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন নামের গ্যাসুলীর নাম রাখা হয়েছিল কসে মহারাজ। সুধীরচন্দ্র করকে বলতেন 'বাসরাজ'। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল গোঁফ জোড়ার জন্য নাম দেওয়া হয়েছিল 'গোপেশ্বর'। নৃত্যপটিয়সী শান্তিদেব ঘোষকে বলতেন 'নটরাজ'। রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণের নোট নিতেন প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। তাঁকে বলতেন 'নোটবিহারী' বা 'কলমবর্ণ'।

রবীন্দ্রনাথ যেসব ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোও চমকপ্রদ। যেমন অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আত্মাবমানী পাবড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নষ্টনিশ্চিন্দির শর্মা, বাগীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানুসিংহ, শ্রীমতী কনিষ্ঠা, শ্রীমতী মধুমা, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা প্রভৃতি।

তথ্য সূত্র :

রবিচ্ছবি : প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত
রবীন্দ্রকাব্যে ফুল : রবীন্দ্রনাথ সমস্ত
রসসিন্ধির রবীন্দ্রনাথ : ডঃ নিতাই বসু

নষ্টালজিয়া—ইউটোপিয়া সোস্যালরিয়লিজম ও আমরা

অরুণ সরকার

অভিধানে নষ্টালজিয়া শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় 'homesickness'। সব স্বাভাবিক মানুষই তাই। তবুও 'নষ্টালজিয়া' শব্দটি শুনলেই নানাজনের নানা প্রতিক্রিয়া হয়। জীব সমস্যায় জর্জরিত মানুষের কাছে স্মৃতিনেকুর চিন্তাকে অসহ্য মনে হতেই পারে। তাই বলে জীবনানন্দের কবিতা কিংবা নষ্টালজিয়াবাদী বিভূতিভূষণের উপন্যাস 'দিনলিপি'—না পড়ে থাকতে পারবেন। অসম্ভব, পারবেন না।

কতদিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নীচে, অন্ধকারে-সন্ধ্যার ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে দিললজনের ডালে বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা যাওয়া আকাশের মৃদু পত্রে—ছিন্ন ভিন্ন খড়
বুকে নিয়ে সনকের মতো যেন পড়ে আছে নরম প্রান্তর
(রূপসী বাংলা—জীবনানন্দ)

জীবনানন্দের সম্পর্কে আবার এটাও জানা প্রয়োজন।—

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল।
বাসটিতে টানি নি কি জল।
অন্তে হাতে কতবার তাই নি কি মাঠে।
নেত্রোদের মতো আমি কত নদীঘাটে
ঘুরিয়াছি ...
(ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই প্রসঙ্গ টেনে আনতে চাইছি এ কারণেই—মার্কসবাদী সাহিত্যকে আবারও অ-মার্কসবাদী সাহিত্যিকরা তীব্র আক্রমণ (অতীতেও বারে বারে তাঁরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন) শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকালের ঘটনাবলী তাঁদের উৎসাহিত করেছে। মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে ওঁদের অভিযোগ, ওরা (মার্কসবাদীরা) সব সময়ই রুক্ষ বাস্তবকে বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত। ওরা হৃদয়হীন, অতীত সুখস্মৃতি বর্জিত। বর্তুবৈচিত্র্য ওদের মনে কোন প্রভাব ফেলে না। ওরা জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস পড়ে না, লোকগীতি আওড়াইয়া ভাটিয়ালির নষ্টালজিক সুর ও কথা বোঝার ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা শুধুই শ্রমিক-কৃষকের নানা লড়াইয়ের কথা লেখে, পড়ে ও প্রচার করে। ওরা যন্ত্রিক, বাস্তব সর্বস্ব, সৃষ্টি সাহিত্যের সঙ্গে ওদের কোন যোগাযোগ নেই।

ধরা যাক কোন মার্কসবাদী তাঁর গল্প, উপন্যাস বা কবিতায় তাঁর স্মৃতিমেদুর উপন্যাস বা কবিতায় 'স্মৃতিমন্থন করলেন। তাহলে কি তাঁর লেখা Social Realism থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলা যাবে? কখনোই নয়। আসলে একজন মার্কসবাদী যখন তাঁর লেখায় ফেলে আসা জগতের কথা কিংবা তাঁর কল্পনার শ্রেণীহীন জগতের কল্পনার সময় পুরাতনের অভিজ্ঞতায় ডুব দেন তখনও তিনি বাস্তবকে ভোলেন না। মার্কসবাদীরাও স্বপ্ন দেখে, শ্রমজীবি মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন দেখাটা বাস্তবকে বাদ দিয়ে নয়।

আচ্ছা আমরা যদি একটু অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, কেমন হয়। ১৯০৫ সালে প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় লেখা হলেও যে বইটি আজও পৃথিবীর দেশে দেশে বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে কোটি কোটি মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাচ্ছে—তাকে আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ আমি গোর্কির চিত্রায়িত উপন্যাস মাদারের (মা) কথা বলছি। একটু মনে করে দেখুন, সেই সংলাপ...'আমি জানি, সময় আসবে যখন প্রতিটি

মানুষ আর সকলের কাছে তারার মতো হয়ে উঠবে। তাদের রূপে তারা নিজেরাই মুগ্ধ হবে। পৃথিবীর বুকে থাকবে শুধু মুক্ত মানুষ। মুক্তি তাদের মহিমা দিয়েছে। প্রত্যেকটি হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। কারো মনে কোন হিংসা থাকবে না। জীবন রূপ পাবে মানুষের। সেবায়-মানুষের মূর্তি পাবে স্বর্গের মেউল। কিন্তুই মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। মানুষ যেদিন সুন্দর হবে ; সত্য আর সুন্দরের মুক্তিতে পাবে সে তাঁর জীবনমন্ত্র। আর যে মানুষ সারা পৃথিবীকে কোল দিতে পারবে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে, সর্ববন্ধনমুক্ত সে মানুষ হবে নরোত্তম। এই নবজীবনের মানুষই রচনা করবে মহাজাতি।'

অ-মার্কসবাদী সাহিত্যিকেরা একত্রিশ সিগারেটের ধোঁয়ায় রাত্রে বসে, হাতে পানপাত্র নিয়ে, বিদেশী (পাশ্চাত্য) সঙ্গীত চর্চনিতে, মার্কসবাদীদের মুণ্ডপাত করতে করতে কেন নষ্টালজিয়ার সন্ধান করেন? তাঁদের নষ্টালজিয়া তো অতীত কামনা-বাসনাকে ঘিরে। তাঁদের স্মৃতিতে তো শুধু মার্কসবাদ বিরোধিতার জন্য যাবতীয় ষড়যন্ত্রের কাহিনী। এরা স্বার্থপর, আত্মসুখসর্বস্ব, এদের স্মৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এরা নিশ্চয় বলবো না, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করেরা মার্কসবাদী। কিন্তু এরা তো প্রকৃত মানব দরদী।

বিভূতিভূষণের একদিক বিখ্যাত রচনাকে নষ্টালজিয়ার ফসল বলে কথা উঠেছে। এখন এই নষ্টালজিয়ার চেহারাটা দেখা যাক। তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথাতেই আসা যাক। অরণ্য পরিবারের অনুমতি-মহন্তী বেতুটেশ্বর প্রসাদ-বাড়ুরিয়া-রাজুরা বাস্তব সুখ-দুঃখ নিয়েই থাকে। বিভূতিভূষণ নিজের চোখে ভাগলপুরের জঙ্গলমহল ও ভানুমতিদের দেখেছেন। আরণ্যকের পাতায় পাতায় প্রান্তর-পর্বত উপত্যকায়-অরণ্যের ছবি এঁকেছেন নিপুণ তুলির টানে। তিনি অন্যান্য উপন্যাসে জ্যোৎস্নাকে কতবার দেখেছেন, কিন্তু এখানে জ্যোৎস্নার কত রূপ। কতবার, কতভাবে, মাঠে, কাশবনে, পাহাড়ে অথবা 'এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিন মানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে। একে কি বলবো? নষ্টালজিয়া? তিনি যখন পথের পাঁচালী লেখেন তখন পল্লীবাঙলার শৈশব-কৈশোর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে—মধ্যযৌবনে ভাগলপুরের জঙ্গলমহলে বাসসূত্রে। তেমনি 'আরণ্যক' লিখেছেন অরণ্যজীবন কাটিয়ে আসার প্রায় দশ বছর পরে, এই বাঙলায় বসে। হতেই পারে নষ্টালজিয়া, স্মৃতিরমন্থন-সিরিকেল সূত্রে বহিঃপ্রকাশ। তাই বলে কি কেউ বলবেন, তিনি ভাববাদী ছিলেন? কখনই নয়। কারণ তিনিই বলেছেন—'দেশের জন্য মন কেমন করা, একটি অতি চমৎকার অনুভূতি'। আজ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা এই অনুভূতির ঘনিষ্ঠ অংশীদার। মোটেই ভাববিলাস নয়। নির্মম সত্য। মার্কসবাদী বা অ-মার্কসবাদী—উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা চরম সত্য। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আসল কথা বিভূতিভূষণ যে নষ্টালজিয়া ও রিয়ালিজমের মধ্যে সহজেই করতে পারেন, এটা অনেকের চোখেই ধরা পড়ে না, এর জ্বলন্ত প্রমাণ 'অপরাজিত' উপন্যাস একটু দেখুন—

নিশ্চিন্দিপুর আর মনসাপোতার অপু তো এক নয়—মানসাপোতার সেই পুরুতগিরি তো তাকে বাঁধতে পারে নি। ছুটে এলো স্কুলে পড়তে। সেখান থেকে কলকাতার কলেজে-মন ক্রমে বড় হচ্ছে, তাঁর স্বপ্নের পরিধি ক্রমে বাড়ছে। এখন সে সমস্ত পৃথিবীকে কল্পনার মধ্যে বেঁধেছে। একি অপরিণত মন? মন তার পরিণত লাভ করেছে বলেই সেই শিশু অপু আর নেই বলেই তো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অপু, যখন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এলো তখন-সে নিশ্চিন্দিপুর আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে, সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না।'

নষ্টালজিয়া ও বাস্তবের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বিভূতিভূষণকে মার্কসবাদী হতে হয়নি। আবার মার্কসবাদী না হয়েও তিনি ভাববাদীদের মতো কূপমণ্ডুক নন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাও তাঁর ছিল। তাই তার সাহিত্যকর্ম অমর হয়ে আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও একই কথা বলা যেতে পারে। তিনি যখন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি লিখছেন, তখনও তিনি মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেননি। কপিলা-কুবের সম্পর্কের মধ্যে আদিম যৌন যমনা কাজ করেছিলো, একথা সত্য। কিন্তু তার 'ইউটোপিয়া' অর্থাৎ 'মরনাদ্বীপের' বিষয় কি সত্যই অবাস্তব? এই উপন্যাসে বাঙলাদেশের এক ভয়ঙ্কর, দুরন্ত অথচ এক রহস্যময় নদীকে কেন্দ্র করে জেলেদের জীবনের এক করুণ অথচ বাস্তব ছবি আঁকা হয়েছে। বর্ষার সময় ইলিশ মাছের দৌলতে তাদের দুঃখবিধুর জীবনে সামান্য আসে। এরপর সারা বছর ধরে চলে উপবাস, দারিদ্র্যের চরম কশাঘাত। পঞ্চুনারী মালা, বিবাহযোগ্যা পোশী, শ্যামা দাসের পরিত্যক্তা স্ত্রী, রাজু, গণেশ, ধনঞ্জয়ের জীবন তো আর 'কল্পনা' নয়, চরম সত্য। হোসেন মিঞা তাদের নিয়ে যেতে চায় 'মরনাদ্বীপে'। কেউ কেউ যায়ও। এর মধ্যে 'ইউটোপিয়া' অনুসন্ধান বৃথা। হোসেন মিঞার গানের মধ্যে নষ্টালজিয়ার রেশ খুঁজি পাওয়াও যায়, তাতে ক্ষতি কি? রাজুর জীবনে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতায় ইঙ্গিত পেলেও কপিলা-কুবের তো সেই অচেনা দ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলো। একটা ধনবিরপেক্ষ, শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থার ভাবনা কি 'ইউটোপিয়া'? এই ভাবনার সঙ্গে মার্কসবাদের তো কোন দ্বন্দ্ব নেই। এইভাবে লিখতে লিখতেই মানিক মার্কসবাদী হয়েছিলেন। 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখার সময়ও তাঁর মার্কসবাদ সম্বন্ধে আংশিক ধারণা নিশ্চয়ই ছিল। সে সময় বাংলাদেশের তরুণমাত্রেরই এ বিষয়ে ধারণা ছিলো, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মার্কসবাদী বিরোধীও ছিলেন।

সম্পাদক মাপ করবে না তবুও তিনি যেহেতু মনে করেন, সব লেখনীরই তো কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ যাই হোক না কেন, লক্ষ থাকা চাই, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা আর বাড়াবো না। সর্বশেষ যে কথাটা বলা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে (যেহেতু আমি একজন মার্কসবাদী) মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখকদের রচনায় স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা যেভাবে প্রকাশ পায়, অন্য কোন মতবাদে বিশ্বাসী লেখকের রচনায় তাঁর সামান্য অংশই মেলে। আর রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ লেখকরা তো মার্কসবাদী না হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদী লেখকদের মানবতাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেনই। তার বহু প্রমাণ ওদের লেখনীতেই রয়েছে।

পীড়ন

সনৎ বসু

কোথায় হারালি চোখ, দৃষ্টির কুসুম।
আঁধার কুঠরী ঘিরে কীটেদের বাড়ন্ত সংসার
কিম্বুত ছায়া কাঁপে সম্ভোগ জ্বরে
বেনজা জোয়ার ভাঙে কাচের প্রাসাদ

এখন সমর কেন সৈরিনী নারী
রূপের জৌলুষ নেই
পুরুষ্ট স্তনের বৃত্তে অবক্ষয়ী ঘুন ধরেছে
লালসার আঁচ

কে যায় কে যায় বলো শ্মশান চিতায়।
সরিসৃপ অন্ধকার হিস্‌হিস্‌ ফনা তোলে
রাতের শিয়রে

চাঁদের জোৎস্না নেই, সূর্যরক্তা আলো,
এখন আকাশ জুড়ে মেঘ মিশকালো
দৃষ্টির কুসুম ঘিরে অনন্ত তুষার...

একলাই তো সন্ধিক্ষণ।
বোধের পীড়ণ
মনুষ্যের গর্ভে ঠিক জন্ম নেবে
বিদ্রোহী চার্বাক।

দুটি কবিতা

সৈয়দ জাবের আলি

সাপখেলা
নিশিতে স্বপ্ন—দিবসে বিবর্ণ
দিবসে সংগ্রাম—নিশিতে চূর্ণবিচূর্ণ।

অকৃতদার

ব্রহ্মিন পৃথিবী, সাজানো ঘরেঘরে
নদী ঘরে যায় নিঃশব্দে সাগরে।

আগুনের খোঁজে অরন্ধণ ব্রত পালন

সুদীপ চক্রবর্তী

নদী খেলছে ভরদুপুরে
পলাশ ডিহার মাঠে
একটি ছেলে, ন্যাংটো খোকা
পাথরের মতন চাটে।

এই অবিনাশ বাবে নাকি ময়ানমতি ঘাটে?

নদীর সাথে ছেঁড়া কথা
নদীর সাথে ভরদুপুরে প্রেম
টুকরো আগুন বুকে রেখে
নিজেই মুছি শহীন নদীর ক্রেম।

এই অবিনাশ বাবে নাকি আগুন জ্বালা ঘাটে?

আগুন কেন? নদীর কথা বলো
নদীমাতৃক ভাষার ধান দুবেলা তোলো।
ধান নেই, ধান গিয়েছে ধর্মে
এমন আকাল দেখিনি বাপের জন্মে।
বাবা ছিল নদীর মালিক
মায়ের ছিল পাকা ধানের গয়না
এখন ঘরে খরার ঢেউ
খাঁচা বন্দী ময়না।

খামকমিয়ে বৃষ্টি এলো
পথ ডুবিয়ে এক হাঁটু জল
কোথায় যাব, ঠিকানা কী নেই?
উপদ্রুত অঞ্চল।

কী সর্বনাশ, এখন উপায় কি?
পেটের জ্বালায়
প্রাণের দায়ে আগুন খেয়েছি।
হ্যালো...হ্যালো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী.....

এই অবিনাশ বাবে নাকি নিমতলা ঘাটে।

তিনটি ক্ষুদ্র (অ) কবিতা

অনসূয়া রায় চৌধুরী

স্বতন্ত্র

হে ভাই,
পিছনে মানুষ
পুপাশে মানুষ—
মানুষে মানুষে
আচ্ছাদিত তোমার শরীর
তবু তুমি কোথায় পেলে
এমন উজ্জ্বলতা?

ভালবাসা

তোমার মুখ যখন আলোয় জ্বলে
আমার আত্মার অভ্যন্তরে তখন
তুমুল সমুদ্র হিল্লোল।

অহঙ্কার

অন্তত যাবতীয় ভেব প্রবল আত্মবিশ্বাসে
ছেড়ে ফেলে এক নিশ্বাসে
ঠাণ্ডা হয়ে, গুছিয়ে বসে
বলতে গেলাম-
"এবারে বলো....
চেয়ে দেখি
কোথায় তুমি
শূণ্য চেয়ার
শূণ্য প্রাসাদ
একলা আমি।।

খেলাঘর

প্রণব কুমার পাল

শৈশবের কথা চিন্তাকরলে অবাক হতে হয়।
হাঁটি হাঁটি পা-পা খেলনা নিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ
চোখ কোল্য ঠাকুমা-দিদিমার আদর বাপের সোহাগ
মার বকুনি মধ্যে খুনসুড়ি হাত-পা ভাঙা কানামাছি।

এইভাবে কৈশোর এসে ভরালো নতুন কিছু ফুল বাড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে হিমেল শিশিরে ভেজা
কিসলয়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত চিরচিরকে সবুজমন
মুলেছিল গল্প-গানে।
যৌবনে স্নিগ্ধ মানুষের মুখ ভেসেছিল অজান্তে কলেজের শাড়িতে
ভালবাসা বুকজুড়ে এসেছিল অবিরাম বর্ষার কলরোল
সুখ অশ্রুপাত গোপনে বাঁধ বেঁধেছিল তৃষ্ণার নদী।

তুমিতো মেলে দিতে শাড়ি। ঢাকোতে চুলের সমূহ
আয়নায় ব্রণ ওঠা মুখের সৌন্দর্য দেখতে তন্ময়তায়
শুধু পাশেছে আদর কায়দা সংসার ছেলে মেয়ে।

চর্বি কেড়েছে ধমনিচিন্তায়. দুপুর আজে দুপুরেই। শীতের
কাঁপুনি. চর্তুদশী-পূর্ণিমা পাশাপাশি হাঁটছে।

এখন রাত্রির ঘুমে সতর্কতা। বেশিকরে নাড়াচাড়া দেয়
ভবিষ্যত। আগলাতে সময় বয়ে যায় জীবনের টানা গোড়েনে।

'সুখের ছড়া'

অনিরুদ্ধা সেন

কেমন করে লিখি বল
ছন্দ বদ্ধ ছড়া।
এলোমেলো সব খানেতেই—
নেশটি ছন্দ ছাড়া।

মা আমার দুঃখী বড়,
দেখেই এমন হাল
লোভ লালসায় মত্ত সবাই
কেমন বেসামাল।

এ খোঁজে ওর দেবের কেতা—
কতখানি ভারী
নিজে যে ভাই শতক দোষী
খোঁজ রাখে কি তারি?

এই দিন নীতিতে হয় কি কখন!
অন্যায়ের প্রতিকার।
আনতে পারে দেশের মঙ্গল
খোবে অন্ধকার।

জ্ঞানের আলো ফুটলে চোখে
উদার হলে মন।
সব হিংসা দ্বেষ যাবে দূরে
ঘুচবে অঘটন।
দেশের উত্তাল থেমে গেলে;
সব শান্ত হলে ভাই।
মনের সুখে লিখব আমি
সেই সুফল ছড়াটাই।

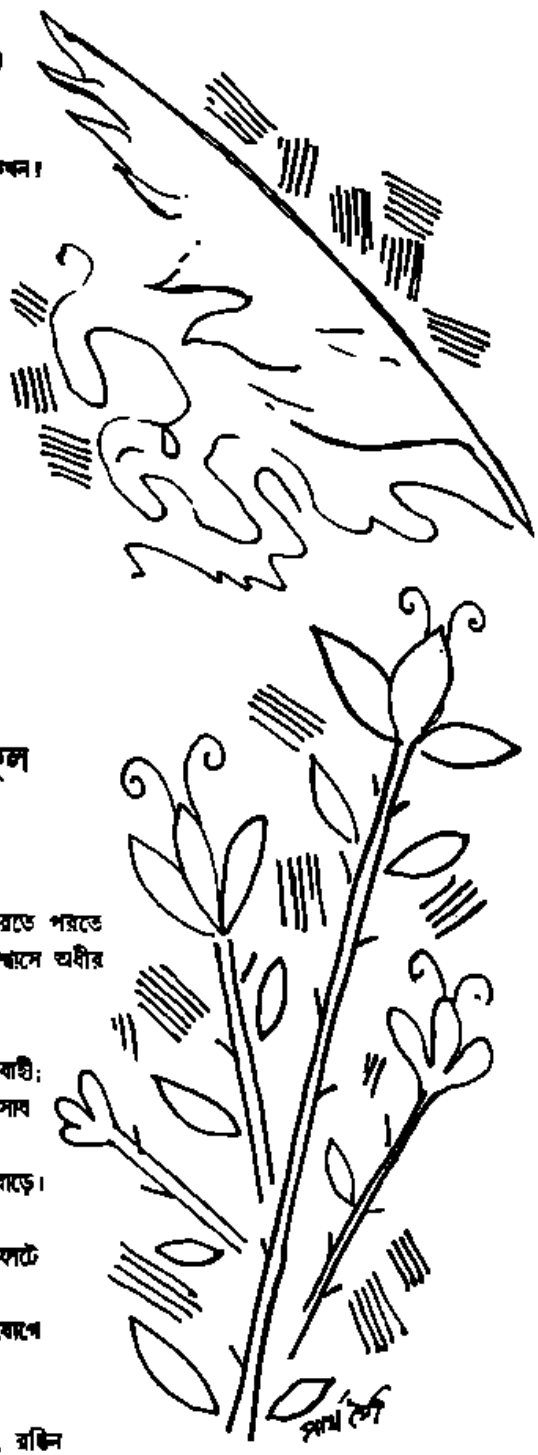

ফুটুককথার ফুল

নিরঞ্জন মণ্ডল

কথাতো পেঁয়াজ নয়, তবু
ছাড়াতেই থাক যদি খোসা পরতে পরতে
ঝাঁঝ ঘ্রাণে বেড়ে যায় দাহ, শ্বাসে অধীর
কুটিলুখী নিমিলীত চোখ।

কথা তো লেবুও নয় অম্লরসবাহী;
তবুএকে নিংড়ানোর পর্যাবৃত্ত সাধ
বলগাহীন হলে
বিপন্ন রসনা তবু তিক্ততাই বাড়ে।

আনরসী তথা কিছু বুদবুদেই ফাটে
ঘ্রানে টের পাই,
পাকা হলে উপাদেয়, নুন সহযোগে
তারিয়েই যাই।

কথাকে গোলাপ ভাবি, সুগন্ধী, রঙিন
সবুজপাতার তলে বিরল কাঁটার,
ফুটলে ছড়োয় মন, ফুটুক তবেল
পারিপার্শ্ব, ন্যাড়া আঙিনায়।

'দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে'—

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

সমুদ্র ঘোষ

'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে,
মহামানবের নব উত্থান জাগল কি রে।
সৃষ্টি তোমার ছেয়েছিল যারা বাহ্যান্তরে
নতুন নামে কি তাদের দোসর আসল ফিরে!
মসজিদ ভেঙে ধূলায় লোটায়
তৃণমূলে তারা পদ্ম ফোটায়
বুটা সিংদের সঙ্গী জোটায়
বিদ্বেষ-বিষ-কলুষ ছিটায়
মহামানবের তীর্থ নীরে।
নাগিনীরা আজো বিষ-নিশ্বাস ঢালে
তাই, দুর্দিনে ঘোর সংকট কালে
আজকে তোমাকে বড়ো প্রয়োজন
কবি ছাড়া তার বৃথা
পণ্ডিত-মন্য মূর্খের দল
বুঝেও বুঝবে কি তা।
নিন্দা তোমার রটাচ্ছে তারা
দুশ্চরন তো।
সাগর পারের নীরদ সি. আর
শতদ্রু পারে খুশবন্ত।
ডাক দিয়ে গেছ বিদায় নেবার আগে
দানবের সাথে সংগ্রামে জাগো জাগো।
তাই, দিন রাত প্রাণের মধ্যে
তোমার বাঁশীর মন্ত্র বাজে
স্তব্ধ হয় নি দানবের ঘড় যন্ত্রণা যে।

স্ফুলিঙ্গ

অজিত কুমার হাজরা

আমাকে ডুবতে দাও নীলাঞ্জনা। অন্য কোনও
দ্বারার ভিতর
তলিয়ে যাই-সৌশব্দে। পৃথিবীর প্রথম
ইতিহাস
তুলে আনি, অথবা যাপান থেকে।
তুমি তো অন্ধকার। ছায়া হয়ে বসে আছো
এতকাল
শোক তাপ জরা ব্যাধি শরীর সর্বস্ব নিয়ে
এতকাল
চাঁদ টিপ কপালে ছেপে অ্যাছো বসে
নীলাঞ্জনা। আমাকে ডুবতে-দাও অন্য কোনও
দ্বারার ভিতর।
খুঁজে আনি যাপনের নিশ্চিত অধ্যায়
অনির্বান। স্ফুলিঙ্গ।

বজ্রের দেশ ঃ দেনজঙ

(ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী)

অজিত কুমার বসু

।। পাঁচ ।।

সেবক থেকেই আমাদের চলার পথ নতুন পরিচয়ের তকমা এঁটে ধরা দিলো। এখন এর পরিচয় জাতীয় সড়ক ৩১-এ। পাপাইয়ের মুখেও এখন এক নতুন আলোর দীপ্তি। সূর্য বা চাঁদের "করোনা" বুঝিবা। হুটানওলের মতো কিরণ শোভা পাচ্ছে তার চোখে-মুখে। সেই আলোর কি আলোকিত আমাদের অন্তরলোক? পরক্ষণেই মনে পড়লো বিশ্বকবির সেই বিখ্যাত লাইন দুটি "সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে, তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশ কালে।"

এতক্ষণ আমরা তিস্তার পশ্চিমপাড় ধরে সোজা উত্তরদিকে এগিয়ে চলছিলাম হঠাৎ সড়কটি সেতু পেরিয়ে হাজির হলো তিস্তার পুবপাড়ে।

বৌদি বললেন : ডাইনে কালিম্পঙ। এখান থেকে আমরা ক্রমেই উপরে উঠতে থাকবো।

বাসটি তিস্তার পুবপাড় বরাবরই এগিয়ে চলেছে। বাঁকের মাথায় তিস্ত ও রঙ্গীতের সংগম। এবারেও বৌদি বললেন : আর কিছুটা এগোলেই "মেল্লী বাজার"। তারপর একটানা নির্জন পথ।

মনে পড়ে সিকিম রাজ্যটি গড়ে তোলার পর থেকে তৃতীয় ছোগ্যাল, 'চাগ-দর'-এর শাসনকালের এক বছর অবধি গোটা কালিম্পঙ অঞ্চলটি সিকিমের অধীনে ছিলো। সিংহাসনের অধিকার নি রাজপরিবারে। একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই বোনের বিবাদের সূত্র ধরে ভুটানের রাজা সিকিমের রাজপ্রসাদ রাম-সেবন-সে আক্রমণ করেন ও দখল নেন রাজা চাগ-দর কোনক্রমে পালিয়ে তিব্বতে আশ্রয় নেন। সতেরশ সাল থেকে সতেরশ আট অবধি দীর্ঘ আট বছর গোটা সিকিম ছিলো ভুটান রাজার অধীনে। তিব্বতের শাসক তখন ষষ্ঠ দালাই লামা শেষ অবধি তাঁর মধ্যস্থতায় ভুটানের রাজা সিকিম অবরোধ উঠিয়ে নেন। চাগ-দর ফিরে আসেন সিকিমে। ভুটানীরা পূর্ব সিকিমের কিছু অঞ্চল এবং সেই সাথে গোটা কালিম্পঙ তাঁদের দখলমুক্ত করেন না। পরে অবশ্য বৃটিশরা কালিম্পঙ অঞ্চলটি নিজেদের দখলে আনেন। এবং ১৮৬৬ সালে দার্জিলিং-এর সাথে যোগ করেন। সেই থেকে কালিম্পঙ দার্জিলিং-এরই অংশ।

মেল্লী-বাজার তিস্তার পশ্চিমপাড়ে, দক্ষিণ সিকিমে প্রবেশ-দরজা।

মেল্লা-বাজার ছাড়াতেই পাপাই এসে বসলো আমার পাশে। বললে ওনো দাদু, সিকিমের, "রেল স্টেশন আর 'বিমান-বন্দর" বলতে আলাদা কিছু নেই। রেলগাড়ি চাপতে হলে, আমাদের মতো ওঁদেরও এন ছে পি কিংবা শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের যেতে হয়।

'এয়ার-পোর্ট বলতেও সেই এক : বাগডোগরা।

তুমি জানলে কী করে?

জবাব এলো : মা, বলছিলো তাই।

পরে বললাম : তোমাদের সময় হতো দার্জিলিং-এর মতো টয়-ট্রেন চালু হয়ে যাবে। আর শুনেছি, গ্যাঙটকে ইন্দিরা বাইপাসের পশ্চিমে "হেলিপ্যাড" বা "উড়ো জাহাজের রিজা" বলে না কি, হেলিকপ্টারে নামা ওঠার ব্যবস্থা আছে।

পাপাই সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে

ওঠে : ঘরে।

পর মুহূর্তেই সে তনতনিয়ে ওঠে : ট্রেন-টেন আসত হেলিকপ্টার বানিয়ে ফেলি সুন আকটার।

বাগডোগরা এয়ার-পোর্ট-এর বাইরে ইতিমধ্যেই নাকি প্রাইভেট হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে। এই বাড়তি সুবিধার কথাটা বলবার আর সুযোগ কই।

আছে পিঠের সহযাত্রীদের দু-চারজন কখন যে পাপাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বুঝতে পারিনি। উপজাতি গোষ্ঠীর একজন বয়স্কা মহিলা বেশ সুন্দর বাংলা বলেন। কিছুক্ষণ আগেই শুনেছি, বেশ খানদানে বাংলার বৌদির সাথে আলাপ করছিলেন। মনে এসেছিলো। "যাই বলুন না কেন দিদি বেড়াবার পক্ষে দার্জিলিং-এর থেকেও আরও বেশি সুন্দর। অনেক কিছু দেখার আছে। লোকজনও খুব ভালো। থাকবার সুবিধাও অনেক বেশি। তিনিই পাপাইকে কাছে ডেকে আলাপ জুড়ে দিলেন। একসময় বলতে শুনলাম : অনেক কিছু তো জেনেছ দেখছি। যেখানে যাচ্ছ সেই 'প্যাঙটক' শব্দের মানে জানো কি?

পাহাড় চূড়ায় ধাপে ধাপে বা শিরায় শিরায় গড়ে তোলা হয়েছে শহরটিকে : নাম তাই প্যাঙটক। শব্দটির মানে হলো : 'শৈল শিরা' বা 'রিজ'।

বাবুসোনা বললো : সামনেই রংপো। এখনো আমরা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আছি। রংপো থেকেই পূর্ব সিকিমের সুরু।

এক সময়ে পাপাই তার ঝোলা থেকে একমুড়ি আনন্দ-সংবাদ বের করে সাদরে বিলালো আমাদের হাতে : জানো, রিজা দিদি বলেছেন : রংপোর কমলালেবুর খুব কদর। রঙটা সোনালী। জেল্লাটার সোনার মতো। খেতেও খুব ভাল।

এতক্ষণ তিস্তার দু'পাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে সৌন্দর্যের নেশা ধরে গিয়েছিলো। এক কথায় : এ শোভার তুলনা নেই। নদী, পাহাড়, বন, ফসলের খেত আপনা আপনি শ্রী ও সম্পদের স্নিগ্ধতা ঢেলে মরমী সহযোগিতার প্রসন্নতায় হাসছে নিবিড় আলিঙ্গনে। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের খাদ বেয়ে নেমে আসছে নদী, সে সব পাহাড়ী চত্বর জুড়ে মনভোলা সহজ বনের উদার হাতছানি। তারই ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠা অসংখ্য ফসলের খেতগুলিতে ঝুকে সাহস ও ভরসা জোগানো কর্মীরা কৃষিজ সম্পদ।

সেসব দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে নিজের অজান্তে হারিয়ে গিয়েছিলাম তা জানি না। সম্বিত ফিরতে দেরি হলো তাই। অবাক হলাম : রিজা-দিদি নামের সম্বোধন সূচক বিবৃতি শুনে। পরে বুঝলাম : প্যাঙটক নামকরণের প্রেরণাদায়িনী "পাপাই"-এর সহজ সরল অভিজ্ঞানে ঐ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

জবাবে বললাম : তাহলে একটু পরেই দেখা পাচ্ছি সেই লেবুর, কী বলো?

পাপাইয়ের পরিবেশন করা মন ভরানো খবরগুলোর স্বাদ পেতে শুরু করেছি আমি। ও বললো : পশ্চিম-সিকিমে বুঝি জানো, দেখবে : চারদিকে শুধু ধান আর ধান। ওখানেই সব থেকে বেশি ধান চাষ হয়। আর এক রকমের ফসল হয় সিকিমে, তার নাম : ফাবর। এ থেকে তুমি 'ভাত' বা 'রুটি' যা মন চায়, খেতে পারো।

এক সময় বলে উঠলো সে : আমি কিন্তু মাংস খাচ্ছি না প্যাংটকে গিয়ে।

কেন-কেন?

যা বাব্বা! ওঁরা যে বাসি মাংস খান।

শীতে বাসি মাংস খেতে তো ভালোই লাগে।

তুমি জানো না, ওঁরা পচিয়ে খেতে ভালবাসেন।

আমাদের বাসটি তখন একটি নদীর সেতুর উপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে। পাপাই-কে ডেকে বৌদি বললো : এই নদীটি হলো দুটি রাজ্যের সীমানা, বুঝলে পাপাই? নাম : রংপো-চু।

আমাদের ডানদিক থেকে নেমে আসা নদীটি সড়ক পেরিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে; মিশেছে তিস্তার সাথে। নদীটা কোথা থেকে এসেছে না?

নাথু-লা আর জেলেপ-লা-র নাম বরাবর নেমে এসেছে।

বাসটা এমন সময় বাঁদিকে মোড় নিয়ে যাচমকা থেমে গেলে কৌতূহলী হয়ে বাইরের দিকে তাকাই। দেখি, উর্দিপরা কর্তাব্যক্তিরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছেন। এটাই তাহলে রংপো চেকপোস্ট।"

কিন্তু, অফিসারী কেতায়?

পাপাই চটপট সড়কের ওপারে নামকলক নির্দেশ করে, বললো : ঐ তো।

কন্ডাক্টরকে তড়িঘড়ি নেমে যেতে দেখেছিলাম এবার ওঁকে খুঁজে পেলাম একজন তদন্তকর্তার সামনে। সওয়াল জবাব চলছে তাহলে।

দুজন অবেক্ষকর্মী বাসে উঠে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক সন্ধান দৃষ্টি বুলিয়ে হঠাৎ-ই নেমে গেলেন।

কন্ডাক্টরকে উঠে আসতে দেখে বুঝলাম : এবার বাস ছাড়বে।

বিনা ঝাঁটাঝুটিতে এত সহজে ছাড়পত্র মেলার পাপাই খুশি হলো না। হতাশা মেশানো গলায় বলে উঠলো : ইস্। নেমে গেলেন ওঁরা?

(ক্রমশ:)

বাস ছাড়তেই আবার নতুন করে গুঞ্জনমুখর হয়ে উঠলো যাত্রী পরিবেশ। পাপাইয়ের মনে ক্ষণিকের জন্যে ওঠা হতাশার কুয়াশাও সরে গেছে। কত পথ পাড়ি দিয়েছি, আরও কত বাকি, তার সরব ঘোষণা করে চলেছে সে।

আমার মন কিন্তু তখনো পিছনেই পড়ে আছে। রংপোকে ঘিরে ১৯৪৯ সালের কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে আমার।

১৯৪৯ সালে রংপো-তে সিকিম রাজ্য কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিলো। ঐ সম্মেলনের "খাজনা নয়" নামে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। আন্দোলন শুরু হতেই শীর্ষস্থানীয় নেতারা হলেন গ্রেপ্তার। ফলে, বন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হলেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। তাঁরা এক বিশাল মিছিলে শামিল হয়ে ঘেরাও করলেন রাজপ্রাসাদ।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বে-সামাল। মহারাজ বাধ্য হলেন ভারত সরকারকে স্মরণ নিতে। ভারতের রাজনৈতিক সচিব অবিলম্বে হাজির হলেন সিকিমে। মধ্যস্থতা করলেন তিনি।

বন্দী-মুক্তির দাবি পূরণ হলো বটে, কিন্তু

আসল দাবি জনগণের সার্বিক ভোটাধিকার, যার ভিত্তিতে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠবে—মহারাজ কী করে মেনে নেবেন সে দাবি? কে চায় নিজের হাতে নিজের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব বিপন্ন করতে? ঠিক হলো : অবিলম্বে একটি কার্যনির্বাহক পরিষদ গড়ে তোলা হবে।

অবরোধ তুলে নেওয়া হলো।

অতঃপর?

ঐ সালের-ই মে মাস, পাঁচ সদস্যের এক কার্যনির্বাহী পরিষদ গড়ে তোলা হলো। কিন্তু একমাস মাত্র টিকলো সে পরিষদ। পরিষদে রাজ্য কংগ্রেসের তিনজন প্রতিনিধি। বাকি দুজন মহারাজার অনুমোদিত। কী কাজ করবে এই পরিষদ? সব প্রশ্নেই মতানৈক্য, বিভ্রান্তি আর কোন্দল। চলতে থাকে পরস্পর। এ এক অচলাবস্থা। পরিষদ ভেঙে দিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো।

ভারত সরকার প্রস্তাব দিলেন : দেশের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য একজন ভারতীয় দেওয়ান নিয়োগ করা হোক। মহারাজ মেনে নিলেন সে প্রস্তাব। পরিষদ ভেঙে দেওয়া, আর ভারতীয় দেওয়ান নিয়োগ—এ দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনা। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা সংশয়ের মধ্যে পড়লেন।

মহারাজা চান রাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে। অপরদিকে, রাজ্য কংগ্রেসের দাবি : ভারতের সাথে সিকিমের অঙ্গরাজ্য সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত্র ইতিমধ্যেই (৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৮) সিকিমে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। দলটির নাম : সিকিম ন্যাশনাল পার্টি। দলটি এতদিন, সরাসরি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে নামে নি। কিন্তু পার্টি সরকারপন্থী এবং স্বভাবতই রাজ্য কংগ্রেসের বিরোধী।

ভারতীয় দেওয়ান এসেই পাঁচ সদস্যের এক উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করলেন। তিনি নিজেই হলেন তার সভাপতি। বাকি চারজন সদস্যের ক্ষেত্রে দুটি রাজনৈতিক প্রতিনিধির সমান সমান। এই উপদেষ্টা কমিটির কাজ হলো : দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি। হলো না। গড়ে উঠলো না কোন প্রকার দলীয় সমঝোতা। বরং ক্ষোভ আরও বাড়লো।

রাজ্য কংগ্রেস নেতারা দিল্লীতে ওঁদের প্রতিনিধি পাঠালেন। ভারত সরকারের মনোভাব কি তা জানতে হবে, সরাসরি আলোচনা করবার দিল্লী, ইতিমধ্যেই যে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে তা ওঁরা জানবে কী করে?

সিকিমের উপর ভারতের সংরক্ষণ ও অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

'সংরক্ষণ' বলতে তো : আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মহারাজার কর্তৃত্ব বহাল রাখা। তাছাড়া আর কী? রাজ্য কংগ্রেস প্রতিনিধি এই নৈরাজ্যের মধ্যেও কিছুটা আশার আলো দেখলেন, যখন তিনি শুনলেন : শীঘ্রই নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামপঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বৃটিশ রাজের সংরক্ষিত রাজ্য সিকিম। এই সংরক্ষণ সেই নিরীখে। এটা ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। ঐ বছরেই ৫ই ডিসেম্বর ঘটে গেল এক বড় মাপের পরিবর্তন। ঐ তারিখের নতুন চুক্তি বলে সিকিম হলো ভারতের আশ্রিত রাজ্য।

ঐ মাসেই গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচন। দিন-ক্ষণ ঘোষণার সাথে সাথেই ধুয়া তুললেন সিকিম ন্যাশনাল পার্টি। আমরা এ নির্বাচন বয়কট করছি।

কারণ?

প্রকাশ্যে বলা হলো : লেপচা-ভুটিয়া স্বার্থক্ষুণ্ন হবে, এইভাবে নির্বাচন করলে। আমরা চাই জাতিভিত্তিক আসন-বন্টন।

রাজতন্ত্রের সমর্থক দলটি, সাম্রাজ্যবাদীদের অপকৌশলে, জনগণের মনে নেপালী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঘৃণ্য বিষ ছড়িয়ে দিলেন।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র দেখা দিলো এক দুঃখজনক পরিবর্তন।

রাজ্য কংগ্রেসের আন্দোলন : সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিলো তার মূল লক্ষ্য।

কিন্তু হায়! এবার যে সেই স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রই এইভাবে অনৈক্যের বিষ ছড়িয়ে দেশের রাজনীতির লাগাম ধরে ফেললো।

ভাঙন দেখা দিলো রাজ্য কংগ্রেসে। এই দলের সভাপতি তাসী-শেরিং। তিনি নিজে ভুটিয়া বংশোদ্ভূত। প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন এই ভাঙন রুখতে। কিন্তু জনগণের মধ্যে যে ধরনের রাজনৈতিক সচেতনা প্রয়োজন, তার অভাবই ব্যর্থ হলেন তিনি।

সিকিম রাজ্য কংগ্রেসে নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধু কি তাই? গোটা-সিকিম নেপালী জনসংখ্যা আর সব আদিবাসীরা মোট সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। নানা কারণে এমন আদিবাসীদের মোট সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। নানা কারণে এমন ঘটে থাকলেও, মূলত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে, ইংরেজ শাসকদের সুচতুর "দ্বি-জাতি নীতির" উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগের ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি।

পরিস্থিতি তো বেশ পেকে উঠেছে। সাধারণ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের এই তো সময়।

হলো-ও তাই। গোষ্ঠী ভিত্তিক সমান সমান আসন। মোট সতেরটি আসনের মধ্যে নেপালী গোষ্ঠী দুটি, লেপচা ভুটিয়া-ও দুটি; বাকি পাঁচটি আসনে মহারাজার মনোনীত ব্যক্তি।

এইভাবে দেশের লোককেও গণতান্ত্রিক-অধিকার দেওয়াও হলো। ওঁদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই তো দেশের রাজ্য পরিষদ গড়ে উঠলো। আর কী চাই।

নেপথ্যে ভাষণ : তাই বলে তো তোমাদের সংখ্যা পরিষ্ঠ হতে দেওয়া যায় না।

আর কর্ম-পরিষদ কী গড়তে তো সরাসরি কোন নির্বাচনের প্রয়োজন নেই।

কি রকম?

ভারতীয় দেওয়ান হবেন সভাপতি।

তারপর?

রাজ্য পরিষদে যাঁরা নির্বাচিত হলেন, ওঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নাও। ব্যস।

বাছাই করবেন কে?

কেন? মহারাজ নিজেই।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে মোট আসন-সংখ্যা তিনটি বেড়ে হলো কুড়ি। বাড়তি তিনটি আসনের একটি মহারাজার মনোনীত প্রতিনিধি (আগের পাঁচ, বেড়ে হলো ছয়। গোষ্ঠী দুটির আসন সংখ্যা প্রতিক্ষেত্রে একই

রইলো।) নতুন করে ঘোষ হলো গোম্ফা বা সংঘের প্রতিনিধি একজন। সাধারণ আসন একটি।

সামন্ততন্ত্রকে হটাতে হলে চাই যে নিরঙ্কুশ সংখ্যা পরিষ্ঠতা। এই ব্যবস্থায় তা কী করে সম্ভব?

সিংটাম পৌঁছাবার কিছু আগেই পাপাই এসে হাঁকডাক শুরু করে দিলো। দাদু দেখ, রংনী-চু সেতু পার হলো। এবার সিংটাম।

আচ্ছন্ন ভাবটা তখনো কাটেনি পুরোপুরি। প্রশ্ন করি। আর তিস্তা।

বৌমার জবাব এলো। তিস্তা এখানে, পূর্ব সিকিমের পশ্চিম সীমান্তে।

ক্রমেই আমরা তিস্তার প্রবাহ থেকে উত্তরপূর্বে সরে আসছি। সড়ক পেরিয়ে রংনী-চু তিস্তার সাথে মিশেছে।

বৌমার কথাগুলো বুকে উঠতে না উঠতেই, বাস থেমে গেল। কন্ডাক্টর জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। সিংটাম।

পাপাই হাততালি দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। কী, বলেছিলাম না।

যাত্রীরা একে একে নামতে শুরু করতেই বাস পরিচালকের সতর্কবাণী শুনে এলো : বাস এখানে মাত্র দশ মিনিট থাকবে। ডানদিকেই রেস্তরাঁ। বাইরে থাকেন না কেউ অপনারা।

রেস্তরাঁটা ছোট হলেও যাত্রীদের সব রকমের রিফ্রেশিং-এর ব্যবস্থা আছে। বরফে ঠাণ্ডা বিয়ারের অর্ডার দিতেই বাবুসোনা বললো। চারটে নয়, তিনটে।

বৌদি বাস থেকে নামেননি। তাঁর জন্য এক পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়ে বেশ আয়েস করে চা পান পর্ব সেরে পান কিনতে গিয়ে শুনি : পান বাড়ন্ত। অগত্যা সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন বেরিয়ে আসছি, তখন দেখি এক চিলতে মিঠে রোদ নেমেছে প্রাঙ্গণে। ছড়ানো সেই আমেজি রূপের বিস্তারের উষ্ণ আলিঙ্গনে মা-বাবার হাত ধরে পাপাই দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়লো। রং-পো ছাড়তেই পাহাড় ঘেরা সবুজ মেখলা শ্রেণী বরাবর হঠাৎ কুয়াশার মতো হাল্কা মেঘ কুণ্ডলী ক্রমবায়ু সঞ্চারে ক্রমেই ঘন হয়ে ছেয়ে ফেলেছিলো গোটা আকাশ। নিভে গিয়েছিলো নিসর্গের আলো। গভীর বিমর্ষতার ছায়া নেমেছিলো চারদিক ঘিরে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট।

এসব মিলিয়ে মনের ওপরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো, তা যে এই আকস্মিক নৈসর্গিক পরিস্থিতির প্রভাবকে সিকিমের জনজাগরণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথমপর্বে ইতিহাসকে অমনভাবে আলোকিত করবে, এ ছিলো আমার স্বপ্নের-ও অগোচরে।

রংপো-তে এক সময় 'প্রধীণ'-দের বাসনা ছিলো; সিংটামে তেমন-ই 'লেপচা'-দের। প্রায় এক সময় থেকে, দক্ষিণ জেলার 'নামচি'-তেও নেপালীদের বসতির সূত্রপাত ঘটেছে। এই সব হাল্কা ভাবনার দুলকিচালে বাসে গিয়ে বসবার ইচ্ছায় এগিয়ে যেতে বাকি আমি। পাপাই যে আমার পিছু নিয়েছে খেয়াল করিনি। কারণ, ভাবনাটা আমায় পেয়ে বসেছে। কোথায় যেন পড়েছি : সবার আগে সিকিমের তরাই অঞ্চলেই নেপালী কৃষকদের বসতি গড়ে ওঠে। অনেকজন ব্রিটীই নাকি তাঁদের স্বার্থে নেপালী কৃষকদের এখানে এনে বসিয়েছিলেন। মূল কারণ দুটো। ঐ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম।

লেপচা-ভুটিয়ারা পাহাড়ী ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মানুষ। দ্বিতীয়তঃ, নেপালীরা কৃষিকাজে দক্ষ, অভিজ্ঞ। তাঁরা লেপচা ভুটিয়ার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু।

সীটে বসতে না বসতেই পিছন থেকে পাপাই বলে ওঠে। দাদু, তুমি কিন্তু অঙ্ক সুন্দর, একটা আলোচনা মীস করলে।

বললাম। তাই বুঝি, তা বিষয়টা কি শুনি?

চোখে-মুখে খুশির আলো ছড়িয়ে পাপাই শুরু করে।

বলতো কিসের কলেন
চলেছ যে দেশ ভ্রমণে,
সবার সেরা এই দুনিয়ায়
তাই, দেশে দেশে রপ্তানী যায়?
বলি। লবঙ্গ কয় দারুচিনি
তাকে ঠিক-ই আমরা চিনি.
খিলি পান বলে : জমবে ভালো
ঘ্রাণ ভুর ভুর, স্বাদ রসালো।

পাপাইয়ের রিজা-মিলি তখন নাস্তা কিনিয়ে ছোট হাজরি সারছিলেন। তিনি তাঁর ভাইটিকে উৎসাহ দিয়ে বললেন। কেয়া বাত : চালিয়ে যাও দলুভাই।

আমি বলি : ওরে। এক 'অমেলা'-তেই আমি ক্লান্ত। হার মানছি।

বাবুসোনা আর বৌমা হাজির হলো এমন সময়।

তাদের বক্তব্য থেকে আলোচনার যে আলো মিললো, তা হলো : এ রাজ্যের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সব রকম ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা মোট জমির প্রায় আটভাগের একভাগ জমিতে এখনই কৃষিকাজ চলছে।

বললাম। নীরস-পাথুরে মাটিতে চাষের জল মেলে কোথা থেকে?

কেন বৃষ্টি। বৃষ্টি তো বেশ ভালোই হয়। মাটিও উর্বর।

বৌমা বললো। এই তো, আমরা যেখানে আছি তার পুবে রাঙ্গালি-তে গড়ে ৩০০ সেমি বৃষ্টি হয়।

বললাম : হোক না?

ওটাই দেশের একমাত্র শুখা-এলাকা।

বাধা দিয়ে বললাম : তবু শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করলে চলে কি?

সুরেন্দ্র রয়েছে নিয়মিত জলসেচের ব্যবস্থা। ভারতের সাথে যুক্ত হবার পর, পুরনো সেচ-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

কেমন?

উনোসত্তর থেকেই নেওয়া হয়েছে নতুন নতুন সেচ পরিকল্পনা। সংখ্যার দিক থেকে নেহাৎ কম নয়। মোট সেচ-পরিকল্পনার তিনভাগের একভাগ নতুন। একই সাথে পুরনোগুলোকেও নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

এবার শুরু হলো ফিরিস্তি। রংনীচুর উপরে ও নিচে দুটো জলবাহী প্রকল্প, রিশির দুটো। এমন কি, সাড়ে চার শয়ের বেশি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেচখাল—কোনটাই বাদ গেল না, সে বিবরণ থেকে।

বাবুসোনা সমাপ্তি টানলো সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক জমিতেই সেচের জল পৌঁছে গেছে।

পাপাইয়ের সংগ্রহে তখনো যে কিছু তথ্য অপরিবেশিত রয়ে গেছে, তা জানতাম না।

সে বললো। সিংটম হলো পূর্ব-সিকিমের পাওয়ার-হাউস। বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

বললাম। আর?

পর্যটকদের দর্শনীয় বিস্তার 'ওয়াটার্স-গার্ডেন', এখানেই একটু এগিয়ে, ডানদিকে পড়বে।

আশ্চর্য!

তারপর?

এ রাজ্যের যাবতীয় জল এখানেই আসে।

কেন?

এখানেই তো হিমঘর। আর, দেশের লোকেরা যে ফলের রস, চাটনি, আচার এতসব খান, সেসব আসে কোত্থেকে? সবই তৈরি হয় এই সিংটমে।

রুটিতে জ্যাম মাখিয়ে পরিবেশন করার পর, একসময় রুটির কাগজ-ও জ্যামের শিশিটি দেখে, ভাবতে থাকি, এত সব তথ্যের উৎস কি শুধু বৌমা, না পাপাইয়ের রিজা-দিদি-ও।...

সিকিমের আকাশে-বাতাসে দৃশ্যের সৌন্দর্য ও রঙের বৈচিত্র্যে ধ্বনিময় হয়ে চলেছে দুটি শব্দের এক মধুর গুঞ্জন।

"তাশী ডেলে", "তাশী ডেলে"; যার বাংলা অর্থ হলো সু-স্বাগতম। সুস্বাগতম!

নদীর কন্ট্রোল যুবি সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তর। "থুচে, থুচে, থুচে।" অর্থে: ধন্যবাদ...

আমরা সেই সুমধুর ডাকে এগিয়ে চলেছি ক্রমাগত ধন্যবাদ জানাতে জানাতে; তার রাজধানী শহরের দিকে।

সিকিম। কেউ বলেন: হিমালয়ের বিউটি স্পট। কেউ বা আবার: হিমালয়ের সুন্দরী কন্যা। আমরা চলেছি: সুন্দরী হিমালয় কন্যার রাজদরবারে। লেপচাদের কাছে সিকিম হলো। স্বর্গ। তাঁরা, তাই, তাঁদের ভাষায় দেশটির নাম দিয়েছেন: নে-মারে-এল। তিব্বতীরা বলেন। সেন জঙ। অন্য নাম: দেমোজঙ। বৌমাকে বলতে শুনেছিলাম: শব্দ দুটির একই অর্থ। সুন্দরো ধানের ক্ষেত।

বাবুসোনা ঠাট্টা করে বলেছিলো: চলন্ত অভিধান।

আরও কত যে নাম সিকিমের। 'অস্ত্রের দেশ', 'হিমালয়ের উদ্যান'—

চকিতে বাধা পড়লো চিন্তায়। বাসটি দেওরালির দিকে এগিয়ে চলেছিলো, হঠাৎ বাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল কী ব্যাপার?

একটা মস্ত বোঝাই ট্রাক রাস্তার মধ্যে উল্টে পড়ে আছে, রাস্তা জুড়ে প্রায় আড়াআড়ি। ঊর্ধ্বমুখী স্তব্ধ চাকাগুলো অসহায়ের মতো আলকাতরিতে চেয়ে আছে আকাশের সীমাহীন বিস্তারে দিশা হারিয়ে।

পাপাই মন্তব্য করে। ডানদিকের অতো বড় পাহাড়টাও কী চোখে পড়েনি? অসাবধানে চললে খাদে তো পড়বেই।

দেওরালিতে নেমে গেলেন পাপাইয়ের রিজাদিদা। কিছুক্ষণ আগে নদীখাতে বারবার বাঁ-হাতি চওড়া সড়কটা দেখিয়ে বলছিলেন: এটাই ক্রমটেক এগোলেই মনাস্ট্রী যাবার পথ। এ্যাডাম পুল পেরিয়ে ক্রমটেক রোড। ঐ পথ ধরে এগোলেই ডানহাতি পাহাড়চূড়ায় ক্রমটেক ধর্মচক্র কেন্দ্র। দারুণ লাগবে। চোখ ফেরাতে পারবে না।

যাবার সময় বললেন: ক্রমটেক দেখতে ভুল করো না, কিন্তু, দাদুভাই।

উচ্ছ্বসিত আবেগ একসাথে ঘন ঘন হাত ও মাথা নাড়িয়ে পাপাই বলতে থাকে। দিদা ভাই, টা টা, বাই-বাই; ক্রমটেকে যেন দেখা পাই।

'দেওরালি' পৌঁছনো মানেই গ্যাংটক মুক্তির হওয়া। বৌমা বললো। পাপাই এবার গান গেয়ে উঠলো: ওভাই ভাইরে নাইরে না। পৌঁছে গেছি সহরের সীমানা। আমার অনেকদিনের শখ, আমি দেখবো রে গ্যাংটক।...

বাসটিও যুবি মুহূর্তে পাপাইয়ের গানে উৎকুল্ল হয়ে: গতিতে নতুন তাল মাত্রা লয়ের পুলকে আকুলিবিকুলি করে ওঠে। পলকেই বুঝি ছাড়িয়ে যেতে থাকে দেওরালি। লালবাজারে, সেনজঙ-সিনেমা; তারপর, একে একে বাঁয়ে প্রাইভেট বাস-স্ট্যান্ড, ডাইনে ট্যুরিস্ট-অফিস, এম জি মার্গ মোড় পেরিয়ে উৎরাইয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, ধরফড়িয়ে কাঁপতে থাকে চাপা উত্তেজনায়।

বেশ কিছু যাত্রী নেমে গেলেন সেখানে।

এতক্ষণে আমাদের ব্যাকুলতার পারদটা বেশ দ্রুত তালে ওঠা-নামা শুরু করেছে। কোথায় নামলে সুবিধা হবে, উঠবো-ই বা কোথায়? কিছুই তো জানা নেই।

নানারকমের বিচিত্র সাজগোজে পৌঁছিনর্তার চলন নেমেছে পথে। নারী-পুরুষদের চলন-চলন · ভঙ্গীময় ছন্দময়তা ঘটা, কর্মব্যস্ততা কি ততটা চোখে পড়ছে? এঁরা কারা? মুহূর্তেই বৌমার কথাগুলি মনে পড়লো। এঁরা সিকিমবাসী বটে, কিন্তু 'সিকিমী' বলে আলাদা কোন জাতি নেই। নেই তেমন "সিকিমী ভাষা" বলে আলাদা কোন ভাষা। এঁরা হলেন লেপচা, কিংবা তিব্বতী অথবা নেপালী, নয়তো বা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠীর লোক। এঁদের মধ্যে কিছু মিশ্র জাতি-উপজাতির লোক দেখতে পাবেন।

এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা আছে। হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চলে। লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী এবং লিম্বু ভাষাও সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রশ্ন করেছিলাম। আর তিব্বতী?

উত্তর এসেছিলো। ভুটিয়া ভাষাই তিব্বতী ভাষা। ভুটিয়া আর ভুটানী এক নয়।

স্বাভাবিক কারণে জানতে চেয়েছিলাম: আর পার্বত্য উপজাতিরা কারা?

কেন? রাই, তামাং, শেরপা, লিম্বু বা চেত্রী, মঙ্গার—এই সব উপজাতির লোকেরা।

এঁরা কি সবাই বৌদ্ধ?

না, ধর্মের দিক থেকে এঁদের প্রধানতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। ধর্মীয় গোষ্ঠীর দিক থেকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর দিক থেকে দুটি ভাগ: লেপচা-ভুটিয়া গোষ্ঠী ও নেপালী গোষ্ঠী। লেপচা-ভুটিয়ারা হলেন: বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। নেপালী-গোষ্ঠী হলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। তবে লেপচা-ভুটিয়ারা মূলতঃ বৌদ্ধ হলেও; এঁদের মধ্যে কিছু খৃষ্টধর্মের লোক দেখা যায়।

বৌমার কথাগুলি মনে পড়তেই, কেন জানি না ব্যাকুলতার মধ্যে সংশয়ের ঘনত্বগুলো মিশিয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে, আর, ততই যেন একটু একটু করে সব দূরত্ব ঘুচে গিয়ে, বড্ড বেশি আপন মনে হতে থাকে এঁদের। সে কী আজ ভারতের ভিতরে, সিকিমের আসার কারণেই, না এর পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য বর্তমান।

অপারেশন গ্রীন

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

দীনেশ চট্টোপাধ্যায়

চার

কাঠমাণ্ডুর হোটেল কাসিনোর চারতলার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে মাইকেল। পরপর তিনদিন ধরে কুয়াশা। গোটা রাজধানীতে সূর্যর দেখা নেই তিনদিন। আজ কুয়াশা খানিকটা পাতলা। সূর্যকে সোজাসুজি দেখা না গেলেও সন্ধ্যা নামতে তখনো অনেক দেরি। সূর্যের আলো আজ কুয়াশা কাটিয়ে শহরে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল মাইকেলের নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। কি একটা ভয় যেন তাকে ঘিরে ধরে যখন তখন। জীবন মৃত্যুর ভয় নয়। ভয় তার অতীতের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলিকে। মা-বাবা এ্যালেনা কিংবা শ্রীথ আর লেনার মুখ মাঝে মাঝে এসে যেন বলে যায়, নো-নো, তুমি ভালো নেই মাইক, ফিরাকো থেকে পালাও। এরা তোমাকে শেষ করে দেবেই।...মা-বাবার কথা মনে পড়লেই মারিকাকে নিজের দেশ বলে আর মনে হয় না মাইকেলের। সেই কবে ক্রীতদাস হয়ে এসেছিল তার পূর্বপুরুষ সেই কবে। আজও ক্রীতদাস! তা নইলে বাবাকে কি যেতে হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে,—না খুন হয় সাদাদের হাতে...। বাবা কি মরবার সময় এক ফোঁটা জল পেয়েছিলো ভিয়েতনাম রণক্ষেত্রে। এতো দেশ তো মাইকেল এতোদিন পর্যন্ত ঘুরলো, কিন্তু কই তার মায়ের মতো মা তো কোথায়ও দেখলো না। লিনা তার শ্রীথের স্নেহের পথে সে কেন কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো।... মাইকেল আজ বোঝে, শ্রীথও মরে বেঁচে গেছে লিয়াকফের খপ্পর থেকে: সে কিন্তু পাচ্ছে না আজো ফিয়াকোর হাত থেকে মুক্তি। মাইকেলের আজকাল মনে হয়, শ্রীথ চিরটাকালই ছিলো সূর্য উজ্জ্বল দিনের মতো সাফসুতরো। তার মতো নয়। কেমন হাসতে হাসতে বলতো—জানো মাইক, ফিয়াকোর আমরা মেশিন। আগে ছিলাম লিভিং এসিনেট। ছিলো সুখ, ছিলো ভালোবাসা; দুঃখও ছিল তখন। কিন্তু এখনও...।—মাইকেলের মনে হতো শ্রীথ যেন কথা বলছে না, কাঁদছে। অপারেশন ১০৭ থেকে ফিরে কি পেয়েছিলো অর্ডার। যাও, এনজয় করো। গিয়েছিলো সেইন নদীর পাড়ে মেহিনী প্যারী নগরী। প্যারিস—, সুখী আর বিলাসী অথচ সাংস্কৃতিক মানুষের রাজধানী, নারী, সুরা আর শিল্প সাহিত্যের ত্রিবেণী সংগম।...প্যারী যাবার আগে ফিয়াকো বলেছিলো, কোন অভাব রাখি না আমরা। তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দিই, কোথাও গোপনমলে জড়িয়ে পড়বে না। আকণ্ঠ পান করো...যোগান দেবে ফিয়াকো...

অপারেশন-১১-এর সাফল্য মাইকেলের জীবনে এনে দেয় স্বদেশে ফেরার ছাড়পত্র। ফিয়াকো বলে দেয়—এখন থেকে তুমি কঙ্গোর বাসিন্দা। নাম প্যাট্রিক টুত্ত।

ফিয়াকো তার ক্যাডারদের পয়সার অভাবে রাখে না। তাই ফিয়াকোর ক্যাডাররা পয়সা দিয়ে বাঘের চোখ কিনতে পারে। পয়সা থাকলে মারিকা বা ফ্রান্সে সব কিছু কেনা যায়। লন্ডন ব্যতিক্রম। ওখানে পয়সা দিয়ে সব কিছু কেনা যায় না। সেক্সের ব্যাপারে ইংরেজরা ভীষণ কনজারভেটিভ। প্যারি কিন্তু এ ব্যাপারে খুবই রসালো। সুসভ্য ভদ্রতাটাই ওখানে বিবেচ্য। মাইকেল দেখেছে, ফ্রান্সে স্ট্রীট গার্লরাও সুসভ্য রসিক পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকেই শয্যাসঙ্গিনী করে না। একবার একটা বেহেড মাতালকে দেখেছিলো মাইকেল প্যারীর এক রেস্তোরাঁয়। লোকটা শালীনতাহীন কথার ছোবার বইয়ে দিচ্ছিলো। এমন সময় সে একটি কলগার্লকে রাতের সঙ্গী করতে চাইলেই মেয়েটি বলেছিলো, মঁশিয়ে, সঙ্গে আমার ঘেন্না নেই। তবে মাতাল দেখলেই বমি আসে। কারণ মাতালের কোন নীতি থাকে না। তুমি homme sans moeurs et sones religion (তুমি এমন লোক, যার কোন নৈতিকতার বালাই নেই।)...আর একবার এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছিলো মাইকেলের। ঘটনাটা ঘটেছিলো ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ড যাবার পথে সীমান্ত শহর বেশানের রেস্তোরাঁয়। সে-রাতে মেয়েদের যোগান ছিলো চাহিদার তুলনায় সামান্য। মাঝ রাত পর্যন্ত মদ গেলার পর যখন খদ্দেররা সব বেহেড হয়ে রাতের সঙ্গিনী খুঁজছিলো, তখন মেয়েদের টাউটরা খুব কসিয়েছিলো চড়া দাম হেঁকে। খদ্দেররা বেহেড হলেও পয়সার ব্যাপারে খুবই টনটনে। তারা বলে, মেয়েদের দাম এতো চড়া কেন?...হে হে করে হাসতে হাসতে টাউটরা বলেছিলো, que voulez vous monsieur? Elles soni plus fraiches! (কি করা যাবে মঁশিয়ে ওরা যে টাটকা।)

রসের বালাই পঃ জার্মানীতে অতো নেই। অনেকটা মারিকার মতো। মাইকেল

যখন ছাত্র ছিলো, তখন ম্যারিকার নরকের চেয়েরা তার নজরে আসেনি। কিন্তু প্যাট্রিক টুসু নামে যখন সে এলো, তখন ম্যারিকাকে নরক বলেই মনে হলো তার। ফিয়াকোর যোগ দেবার পর কতো দেশ গেছে মাইকেল, সব দেশেই কলগার্ল শব্দটা শুনেছে। কিন্তু ফল হয়? ম্যারিকার এবার এসে প্রথম শুনলো নতুন একটা শব্দ, কলবয় অবশ্য কলবয়ের প্রায় সমার্থক শব্দ গিগোলো। গিগোলো শব্দটার অতীতেও শুনেছে মাইকেল। শব্দটির মানে হলো বয়স্কা মেয়ে মানুষের সঙ্গে পয়সার জন্য ভাড়াটে যুবক সঙ্গী। গিগোলোর সঙ্গে সেক্সের যেন সম্পর্কই নেই। কিন্তু কলবয়?

এবার প্যাট্রিক টুসুর ছদ্ম নামে ম্যারিকায় এসে তাজ্জব হয়ে গেল মাইকেল। হোটেল ছেড়ে সদরে সরে পড়তেই লোকটি এগিয়ে আসে : এনগেজড্?—লোকটির প্রশ্ন।

—এনগেজড্?—লোকটির প্রশ্ন।

—মানে?—মাইকেল্ তো অবাক।

—মানে, আমরা মক্কেলরা আপনাকে চায়। ডেট দেবেন?

—ডেট?

ইয়েস। আমার মক্কেলরা আপনার কাছে ডেট চায়।

—মক্কেল? ডেট চায়?—মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না মাইকেল।

—ও ইয়েস। অনেক টাকা দেবে। প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ ডলার।

এক রাতে কজনকে ডেট দেবেন?

—তোমার মক্কেলরা আমাকে চেনে? মাইকেল প্রশ্ন করে।

—সিওর কদিন ধরেতো ওরা আপনার উপর নজর রাখছে। ঠিক তোমার মতো রোবাস্ট হেল্‌থের লোক চাই আমার মক্কেলদের।

—তা তোমার মক্কেলরা কারা?—চিবিয়ে চিবিয়ে বলে মাইকেল।

ওনারা নু-ইয়র্কে'র বড়ো ঘরের মেয়ে আর বৌ। ওদের ঠিক আপনার মতো কালো আদমী দরকার।

—ওরাও কি কালো?

—না, না, ওরা সাদা মেয়ে।

হঠাৎ নিজেকে অসুস্থ বোধ হয় মাইকেলের। নয়, আর রাস্তায় নয়। হোটেলে ফিরে যাবে। নিজের ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পেছনেই দেখে লোকটিকে। ও পেছনে পেছনে এসেছে। হঠাৎ রেগে ওঠে মাইকেল।—কি চাও? লোকটা ঘাবড়ে গিয়েও বলে ডেট্। এক ধমক কষিয়ে মাইকেল বলে, গেট আউট।..ভয় পেয়ে লোকটা পালাতেই হেসে ফেলেছিলো মাইকেল। হায়। সিকেনের স্বপ্নের দেশ ম্যারিকা। অন্য দেশ থেকে লুট করে নিজের ঘরে অলঙ্কীর সম্পদের পাহাড় গড়ছে। কিন্তু তোমার সব সুস্থতা যে রাধগ্রাসে শেষ হয়ে গেলো। আজকের ম্যারিকা দেখে বোধহয় সিকেন তার নিজের কবরে শুয়েই চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিচ্ছেন।

(পাঁচ)

ফাঁসির আসামী থেকে মুক্ত দুনিয়ার সৈনিক—এমন একটা ভাবনা নিয়ে ফিয়াকোর মাইকেল প্রথম থেকেই খুশিই ছিলো।_কিন্তু শীখ প্রথম থেকেই অখুশি।_ছাত্র হিসেবে গোড়া থেকেই সে ছিলো ব্রিলিয়ান্ট। নিজের বংশগৌরব নিয়ে তার গর্বের শেষ ছিলো না। কথায় কথায় বলতো,—আমার পূর্বপুরুষরা এসেছিলো ইংল্যান্ড থেকে। তারা অবশ্য ম্যারিকায় এসে নিজেদের ম্যারিকান ভেবেছিলো। বিদেশী বা বহিরাগত ভাবে নি। তারা লড়েছিলো ম্যারিকার জন্য ম্যারিকার স্বাধীনতার জন্য। আমি তাদেরই বংশধর।

সময় পেলেই মাইকেল শীখকে জিজ্ঞাসা করতো তার ছেলেবেলার কথা। মাইকেলের মনে হতো, শীখের বাবা আর মা ছিলেন আদর্শ। এক এক দিন নিজের কথা শোনাতে গিয়ে শীখ ডুবে যেতো অতীতে...নিজের ছাত্রাবস্থায়...তখন শীখের বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শেষ। ব্যাঙ্কের চাকুরে ছিলো মা। আর বাবা অধ্যাপক। পড়াশুনো শেষ হতেই ছাত্র জীবনের ছবিটাকে প্রফেসর করতে চাইলো শীখ। বোল মিলিমিটারের ক্যামেরা কাঁধে চড়িয়ে কলেজের ছাত্র জীবন ঘুরছে। ছাত্রজীবন শেষ হতে তা শীখের জীবনে পেশাদারী দায় নিতে শুরু করে। তার বাবা আর মাও তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলো—ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার চোখ রাখবার আগে বন্ধুকে চিনতে শেখো। ...পড়াশুনো শেষ। এখন একটাই কাজ। বোলো এম এম মিনিইক্সর্ভের মন্টক্লেয়ার থেকে'ওলিকে কলি আইল্যান্ড ও অন্যদিকে রোসারিভল থেকে হাটি অঞ্চল শীখের শিল্প পরিক্রমার পথ। লোকেশান একটাই, কিন্তু শট ভিন্ন ভিন্ন। এমনি করেই একদিন শীখ গড়ে তোলে তার প্রথম ডকুমেন্টারী "নেকেড হোমল্যান্ড"—, উলঙ্গ স্বদেশ। প্রিমিয়ার শোতেই জয় জয়কার। ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার ক্রিন ক্রিটিক লিখে নিলো, শিল্পীর চাই এক চোখ। দু'চোখ নয়। উলঙ্গ স্বদেশের পরিচালনা কাম-ক্যামেরাম্যানে শীখের আছে এক চোখ। তাই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছেন তিনি। উনি যেন রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার। বৃটেন জয় করতে এসে বলেছেন—তিনি ভিত্তি-ভিসি। আসিলাম-দেখিলাম জয় করিলাম। এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম ইন্ডিয়ার সত্যজিৎ রায়ের-র মধ্যে।...

ফিয়াকোয় এসে শীখ মাইকেলকে বারবার বলেছে উলঙ্গ স্বদেশের বিষয়ে। জানো মাইক, ম্যারিকার সাধারণ মানুষরা একটা সত্য আর একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলো। এরা রাষ্ট্র পরিচালকদের মতো পরদেশ লুণ্ঠন করতে চায় না। এরা চায় ন্যায্য অধিকার আর পৃথিবীকে নির্ভার দিতে। ঠিক এমন বিষয়কে ছবির ভাষায় ধরার চেষ্টা করেছি উলঙ্গ স্বদেশ ছবিতে। জানো মাইক, তোমার বাবাকে ভিয়েতনামে যেতে হয়েছিলো বুড়ো বয়সে, কারণ তিনি কালো আদমী কি, তাই না?

—হ্যাঁ।...বাবা সেখানেই মারা গেলেন।

—জানো ভাই, মানুষ কখন হাতিয়ার তুলে নেয়?

—কখোন?

—যখন মানুষ দেখে—রক্ষক ভক্ষক হয়ে উঠেছে। আর মজাটা জানো?

—কোথায় মজা?

হা হা করে হাসতে হাসতে শীখ বলেছিলো, মজাটা হলো এই যে ন্যায্য কারণে মানুষ হাতিয়ার তুলে নিলে কওয়ারা সেই মানুষকে বলবে কমুনিস্ট। জানো, আমার ছবিতে এক নিগ্রো শ্রমিক হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলো।

—তা হাতিয়ার খোলার কারণ তো দেখিয়েছে?

–নিশ্চয়ই। কারণ তো ছিলোই।—এক সাদা যুবতীকে ধর্ষণ করতে এলো একজন ওতা। পুলিশ থাকলো দর্শকের ভূমিকায়। কারণ ধর্ষণকারীরা বড়োলোকের ছেলে। এমন দৃশ্যে এক গরীব নিগ্রো যুবক পুলিশের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে সাদা ওতাদের গুলি করে মারে। বিচারে নিগ্রো যুবকের ফাঁসি হয়ে যায়।

–হ্যাঁ। এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো জেফারসন সিটিতে।

–ঠিকই ধরেছো মাইক। ও ঘটনাটা জানি। পুলিশ সাদা আর সাদা ভদ্রলোকের দল যুবকটিকে খুন করেছিলো। শীখ মাইকেলকে সমর্থন জানায়।

–কিন্তু তুমি তো ফাঁসি দেখাসে যুবকটির?

–হ্যাঁ। দেখিয়েছি। কারণ আমি দেখাতে চেয়েছি যে ম্যারিকার বিচার বলে কিছু নেই।

সত্যি বলতে কি উলঙ্গ স্বদেশ ছবিটাই শীখকে খুনী করে তোলে। অথচ নিনাকে কে খুন করেছিলো, বা আদৌ নিনা খুন হয়েছিলো কিনা, তা জানে না শীখ। একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে খুনের অপরাধ মাথায় তুলে তাকে পালাতে হয়েছিল টিটিকাকা লেক অঞ্চল ছেড়ে। শেষ পালাতে পালাতে একদিন এসে পড়েছিল কিয়াকোর দপ্তরে। সেই থেকে শীখ কিয়াকোর নির্ভরযোগ্য কাভার।

একদিন শীখ বলেছিলো মাইকেলকে—জানো মাইক, আমার উলঙ্গ স্বদেশ রিলিজ হবার অনেক আগে কিউবায় বিপ্লব ঘটে যায়। বিপ্লবের নায়ক ফিডেল কাস্ত্রো আর বিপ্লবের রূপকার চে-গুয়েভারা তখন মার্কিনীদের আতঙ্ক। মার্কিন কর্তাদের ঘুম তখন চলে গিয়েছে। একে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। পেন্টাগন বারবার চেষ্টা করেছিলো কিউবাকে গ্রাস করতে। কিন্তু সব বৃথা—তখন।

শীখ কোন কথাই ভোলে নি। তখন সে ছাত্র।

স্কুলের সেভেনথ স্ট্যান্ডার্ডের। একদিন শুনলো, ক্যারাবিয়ান উপসাগরে সঙ্কট। ম্যারিকা সমুদ্র অবরোধ করেই কিউবায় গানবোট পাঠাতে চায়। ক্লাসের ইতিহাসের মাস্টারমশাই হেসে বলেছিলো, কিউবার সাহস তো কম নয়। খোদ রাষ্ট্রপতি কেনেডির কাঁধে এসে কেনেডিরই গোঁফ উপড়ানো। কিউবার সঙ্কটের সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিলো ইন্ডিয়াতে। ভারত-চীন সীমান্তে সে কী গোলমাল। ইন্ডিয়াতে তখন ম্যারিকার রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ সাহেব। তিনি গেলেন চীন-ভারত সীমান্ত দেখতে। শীখের বাবা বলেছিলো,—গলব্রেথের চীন-ভারত সীমান্তে যাওয়া অন্যায়। প্রাচ্যের দুই প্রাচীন দেশের সীমান্তে তোর নাক গলানোর কি দরকার?..শীখ বড়ো হয়ে একটা বই পড়েছিলো বইটার নাম-—থান আরুন্ড্ ডিল্লী, লেখক-ব্রাট্রান্ড রাসেল। বইটা পড়ে বুঝেছিলো। আর ম্যারিকার পরামর্শে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল অন্যায়ভাবে চীন সীমান্ত আক্রমণ করতে তার ফৌজিকে নির্দেশ দিয়েছিলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনোর শেষ বছর। চিলির রাষ্ট্রপতি আলেন্দে খুন হলেন ম্যারিকার সমর্থিত সামরিক জুন্টার হাত। ওরা খুন করলো কবি পাবলো নেরুদাকে। কবি খুন হলেন আলেন্দের খুনীদের সমর্থন করেননি বলেই। সেদিন শীখ অনেকের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছিলো পেন্টাগনকে ধিক্কার জানাতে।

পেছনে ফেলে আসা ঘটনার কথা বলতে বলতে একদিন শীখ বলেছিলো,—মাইক। ম্যারিকার রাষ্ট্রনায়কদের কোন আদর্শের বালাই নেই। আমার ছবিতে আমি সেই কথাই তুলে ধরেছি।—জানো মাইক, আমার কিয়াকোর আসাও একটা ষড়যন্ত্র। যারা আলেন্দেকে খুন করেছিলো—তারা কবি নেরুদাকে খুন করে, তারাই ভিন্ন মুখোশ পরে কিয়াকো চালায়। আমার সব কথা শুনলে তোমার মনে হবে—এটাও একটা কাহিনী।

ট্রেনিং পিরিয়ডের কোনো এক সময় শীখ বলেছিলো তার কাহিনী।—উলঙ্গ স্বদেশের সাফল্যে তখন সবার দৃষ্টি শীখের উপর। তার বাবা আর মা বলতে গেলে ছেলের জন্য গর্বিত। কিছুদিন পরে ফিডেল কাস্ত্রো নিমন্ত্রণ করলো শীখকে।—আমাদের কিউবা আমাকে কাছে পেতে চায়। ম্যারিকার ছাত্র মহলে তখন তরুণ পরিচালক শীখের দারুণ প্রভাব। সরকার তো তাকে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সমর্থক বলে প্রচার করতে দ্বিধা করছিলো না। এমন সময় এক ভদ্রলোকের চিঠি এলো। পত্র লেখকের নাম হোরম্যান গল্লাগেস। চিঠিতে একটা প্রস্তাব। পৃথিবীর সর্বোচ্চ হ্রদ দক্ষিণ ম্যারিকার টিটিকাকা। সেই হ্রদের পাড়ে একটা ছবি তোলা হবে। ছবির পরিচালক হিসাবে গল্লাগেসের পছন্দ শীখকেই।

সম্মতি জানিয়ে শীখের চিঠি ডাকে করবার দশদিনের মাথায় হোরম্যান গল্লাগেস এসে হাজির। মুখোমুখী সাক্ষাতের প্রথম দিনেই শীখের পারিশ্রমিক বিষয়ে কথাবার্তা ফাইনাল করে গল্লাগেস। তার শেষ কথা সে জানিয়ে বলে, টাকার জন্য আটকাবে না। টিটিকাকা লেকে যাবার আগেই বিনা কাগজে পড়ে গল্লাগেস শীখকে নগদ এক লক্ষ ডলার থ্যাডভান্স করে দেয়। শীখ তো অবাক।

–মিঃ শীখ। আমি অর্থভক্ত ক্রীশ্চান। মানুষকে বিশ্বাস করি। কেননা মানুষ হলো ঈশ্বরের সন্তান।—কথা শেষ হতেই প্রতিবার গল্লাগেস ক্রুস করে। তার এতেই শীখের মার কেমন কেন সন্দেহ। শীখের বাবার কিন্তু মনে হয়েছিলো লোকটি বাস্তববাদী।

শীখের মা একদিন শীখের বাবাকে জিজ্ঞাসা করে লোকটির সঠিক বাড়ি কোথায়?

–পৃথিবী নামক গ্রহে।—হাসতে হাসতে হাল্কা উত্তর দিয়েছিলো শীখের বাবা।

টিটিকাকা লেক অঞ্চলে পাড়ি দেবার আগে গল্লাগেস আরেকবার আসে শীখদের বাড়ি।

শীখের মা প্রশ্ন করেছিলো, ওনেছি দক্ষিণ ম্যারিকার পশ্চিম উপকূলে, বিশেষ করে পেরু আর বলিভিয়া জুড়ে গোলমাল চলছে মিঃ গল্লাগেস। এ অবস্থায় ওখানে যাওয়া কি ঠিক?

–তাতে আমাদের কি? আমরা তো ওই দেশের সরকারকে উৎখাত করতে যাচ্ছিনে না।..আমরা যাচ্ছি ছবি তুলতে। আমরা আর্টিস্ট। আমরা যাচ্ছি দক্ষিণ উপকূলের তীরভূমিতে; পলিনেসিয়ার মেঘ-আকাশে। গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা সহজ মনোভাব গল্লাগেস কণ্ঠে।

—আপনি দেখছি টিটিকাকা লেকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেছেন হাসতে হাসতে বলেছিলো শীখের বাবা।

–নিশ্চয়ই। এটা এই Se armor non i. chedunque (যদি প্রেম না হয়, তবে কি?) প্রশ্নখোলা হাসি ভরে পড়েছিলো গল্পালেসের মুখে।

নির্দিষ্ট দিনে ছবির ইউনিট সঙ্গে নিয়ে গল্পালেস বেরিয়ে পড়েছিল গন্তব্যের পথে। সময় মতো স্পটে পৌঁছে সবাইকে দিনকয়েক রেস্ট নিতে বলে। পথে শীথের সঙ্গে পরিচয় হয় নিনার। এ ছবির নায়িকা। ও রাশিয়ার মেয়ে। ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী। নায়ক ভিক্টরের সঙ্গেও পরিচয় হয় পথে। সে লন্ডনের ছেলে। নিনার মতো শীথ দেখেছিলো সেন্সের বাড়াবাড়ি। ভিক্টর কিন্তু বিপরীত। সে যেন সন্ন্যাসী।

টিটিকাকার পৌঁছানোর দিনকয়ে পরে প্রডিউসার গল্পালেসের ঘোষণায় চমকে ওঠে শীথ।–এ ছবির পরিচালক এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবে শীথ। নায়িকা অবশ্য নিনাই।

গল্পালেসের এ ঘোষণা শীথকে উত্তেজিত করে। পরিচালক হিসেবে নেকেড হোল্ল্যান্ড তাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এবার নায়ক হিসাবে তার কৃতিত্ব দেখাবে। নায়ক পরিবর্তন কিন্তু একেবারে সমালোচিত না হয়েও টিমের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের জন্ম দেয়। ভিক্টর কিন্তু একেবারে নিরুত্তাপ।...একদিন গল্পালেস বলে, মিঃ শীথ। আমি ভাই টাকার যোগানদার। লোকেশন সট স্ক্রীপ্ট–ওসব আপনার ব্যাপার। আমার টেস্টে এই আমি বডি ফেললাম।

স্ক্রীপ্ট তো নিউইয়র্কে বসেই তৈরি করেছিলো শীথ। তবু সট ডিভিশন, লোকেশন কতো কাজ। ক্যামেরাম্যানের কাজ বোঝার জন্য নিনার আর নিজের কয়েকটা ক্লোজ আপ ছবিও তুলতে বলে শীথ।

না–, ক্যামেরাম্যান পাকা লোক।

ভিক্টর আর নিনাকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল লেকের পাড়ে কিছুটা ঘুরে বেড়ালো শীথ দিন কয় ধরে। লেক তো নয় যেন মহা সমুদ্র। লেকের আয়তন গাইড বুকে দেখে শীথ অবাক। লম্বা চওড়ায় বর্গক্ষেত্র ধরলে লেকের ক্ষেত্রফল ৩২০০ বর্গমাইল। বর্গক্ষেত্র হিসেবে এক এক বাহুর পরিমাণ ৫৭ মাইলের কিছু বেশি। সমতল থেকে লেকের উচ্চতা ১২০০৪ ফুট। ডিসাওয়ে ডেরো নদীর জল টিটিকাকা হ্রদে মিলেমিশে একাকার।

কদিন ধরে লেক অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালো সবাই। ধীরে ধীরে নিনার সঙ্গে শীথের গড়ে ওঠে এক হৃদ্য অন্তরঙ্গতা।...সময়টা ছিলো বর্ষার। চির মৌসুমী অঞ্চল বলে সারা বছর বৃষ্টির শেষ নেই। তবে আবহাওয়া কিন্তু না গরম, না শীতল, আর্দ্রতার জন্য সবসময়ই স্যাঁতসেতে। লেকের ৭–মাইলের মধ্যেই দক্ষিণ অঞ্চলে ট্রপিক সমুদ্র।

নিউইয়র্কে শীথ দেখেছে ইটের পর ইট। অট্টালিকার জঙ্গল। আর এখানে অরণ্যের সাম্রাজ্য। কদিন ধরে কেবল বৃষ্টি। ফলে টেন্টে থাকতে হচ্ছে বেশি সময়। নিনাও আড্ডা দিতে থাকে শীথের টেন্টে। নিজের টেন্ট বলতে গেলে যেতেই না। জোরে দূরবীন লাগিয়ে দেখে লেকের জলচর প্রাণীদের। গল্পালেস সবাইকে বলে দেয়,–সাপ, এ অঞ্চলের সাপ খুব বিষধর। কামড়ালে রক্ষা নেই।

শীথরা লেকে পৌঁছানোর পর, প্রায় দিন বিশেক কেটে যায়। কাজ এগোয় না এতোটুকু। এই সময় ওয়াশিংটন সিনের একটা সংখ্যা এলো টিম ম্যানেজারের কাছে। একটা সংবাদ নিনা আর শীথের বিষয়ে ওরা লিখেছে। স্পষ্ট ভাষায় কাগজ লিখেছে, বামপন্থী পরিচালক মিঃ শীথের বেফেয়াপনা। কম্যুনিস্ট নায়িকার কাছে আত্মসমর্পণ। নায়কের ভূমিকা থেকে ভিক্টরের অপসারণ। টিটিকাকা লেকে বসন্তের হাওয়া...। সংবাদদাতা আরো লিখেছে,–বিশেষ সূত্রে প্রকাশ যে নায়িকা নিনার সঙ্গে শীথের এই যৌন স্বেচ্ছাচারের নেপথ্য নায়ক প্রডিউসার হোরেন্যান গল্পালেস, আসলে কে জি বি-র কুখ্যাত এজেন্ট।...সংবাদ পড়ে শীথ উত্তেজিত হয়। সে বলে, এসব মিথ্যা। নায়িকা নিনা সহজভাবেই বলে, মিথ্যাকে কাগজে সত্যি বলে চালাতে চায়। এবার সত্যিটাই দেখুক। ইয়েস, আই লাভ শীথ।...গল্পালেস কেবল বলে, বোগাস! গাঁজাখোর।...ইতিপূর্বে নিনা আর শীথের মধ্যে সম্পর্কের যে গভীর ছিলো সংবাদটা তা ভেঙে যেন চুরমার করে দিলো।

কদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। তার মধ্যে প্রডিউসার গল্পালেস তাড়া লাগায়–মিঃ শীথ, এবার লোকেশন ফাইনাল করে কাজ আরম্ভ করুন।

শীথ ভেবে নিনা আর ভিক্টরকে সঙ্গে নিয়ে ফাইনাল লোকেশনের জন্য বের হয়। গল্পালেস সাবধান করতে ভোলে না, কায়ার আর্মস নিতে ভুলবেন না আপনারা।

সেদিন টেন্ট এলাকা ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলো সবাই। নিনা বারবার পিছিয়ে পড়ছিলো। হঠাৎ চিৎকারে শীথ দেখে গাছের উপর প্যান্থার জাতীয় কিছু। ভিক্টর চিৎকার করে বলেছিলো,–মিঃ শীথ, ফায়ার...

ঘটনা বলতে বলতে শীথ থামতেই মাইকেল বলে ওঠে, তারপর?

—তারপর আমি খুনী হয়ে গেলাম। হাসতে হাসতে বলে শীথ।

–নানে?–মাইকেল আবার প্রশ্ন করে।

–ওসবে না কি বললাম? গাছের উপর নেকড়ে মতো কিছু একটা দেখেছিলাম। নিনা সবার পেছনে। সামনে ভিক্টর। নরবধের ভাবি। নিনার নিরাপত্তার কথা ভেবে ফায়ার আর্মস তুলে ওলি করলাম। ওলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম নিনার আর্তচিৎকার। ছুটে গেলাম নিনার কাছে। একি! নিনা মাটির উপর। তার মাথা দিয়ে রক্তপাত? থৈ থৈ রক্তে সে ভাসছে।–একটু আগে শীথ। তারপর আবার বলে, গল্পালেস এসে পড়ে স্পটে। ও আমাকে সরিয়ে নিয়ে যায় টেন্টে। ভিক্টর রক্তমাখা দেখিয়ে নিনাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করে। বলে, শীথ নিনাকে দিয়ে নিজের যৌন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেনি বলেই ওলি করে ওকে খুন করেছে।

...সেই রাতেই গল্পালেসের পরামর্শে সরে পড়েছিলো শীথ। সঙ্গে অবশ্যই গল্পালেস। পথে একটা পোস্ট পত্রিকা দেখেও। কাগজ লিখেছে,—খুনী শীথ।...গল্পালেস সদা দেয় পালাও পালাও।...সব ব্যবস্থা সে করে দেয়। শেষতক পালাতে পালাতে পালাতে ফিজাকো।

–আর গল্পালেস?–মাইকেল প্রশ্ন করেছিলো।

–কেন গল্পালেস নয়, নিনা, ভিক্টর সবাই। ফিয়াতোর এজেন্ট। বিশ্বাস করো মাইক। আমার গুলি কখনোই নিনাকে আঘাত করেনি।

দুই পৃথিবী

কঙ্কণ সরকার

এইনাত্র যে মেয়েটা সেকেণ্ডকে উগ্র সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে গেল : তাকে, আপনারা চেনেন!

না, চেনবার কথা নয়। আমরা এখানে এসেছি নতুন। আর তাছাড়া আজকাল এরকম কত সুন্দরী রাস্তায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সবলাকে চেনা-জানার কী দরকার। পথে দেখছ, ভালো লাগছে। ব্যস! এই পর্যন্তই। অতো চেনা বা জানার সময় কোথায়। সারাদিন পথে পথে এরকম কতজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। ভালো লাগে, এই টুকুই। ভালো লাগার [illegible] তো জীবন, ভালোবাসার কতটুকু কী আছে!

কিন্তু কী বলবো, আমি এই মেয়েটাকে ভালোবাসি। ওর নাম মধুমতী। নিবাস নিশ্চিন্তপুর। গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে বছরেক মাস। এরই মধ্যে ওর অনেক বদল হয়েছে। পোশাকে-পরিচ্ছদে, আচরে-ব্যবহারে এমন পরিবর্তন আনতেও আকৃষ্ট করেছে। গ্রামের একটা সহজ সরল মেয়ে কিভাবে বদলে যায়, আমি ওকে দেখে তা লক্ষ্য করেছি।

সাজগোজের ব্যাপারে ও বরাবরই একটু মনোযোগী। বলা বাহুল্য সাজতে ও ভালবাসে, রান্নাবান্না ঘরসংসারে ঠিক ততটা নয়। তবে ওর একটা মাত্র গুণ আছে সব কিছুকে সহজেই মেনে নিতে পারে। সেজন্য আমাদের বাড়ির অভিভাবকদের কারো কোনো আপত্তি ছিল না ওর সাজগোজে। বলতো : সাজুক না, এই তো বয়েস ; এরপর কী আর সাজবে?

আমি গ্রামের ছেলে। সামান্য একটা কেরাণীর চাকরি করি। মাসে মাসে ওভারটাইম পাই। তাতে ওর সখ আহ্লাদ পূরণের ঘাটতি ছিল না। ফি বছর একবার টাকা জমিয়ে ঘুরেও আসি সমুদ্রপাহাড়। ভালই লেগেছিল। এরমধ্যে বড়সাহেবের নজরে পড়ে গেলাম। অফিস ছেড়ে সাহেব আমার বাড়িতেও আসতে লাগলেন। মধুমতীর সঙ্গে পরিচয়ে সাহেব তো মহাখুশি। কোন পার্টিতে ফেললেন। মাসে মাসেই গাড়ি নিয়ে আমার বাড়ি হয়ে সাহেব ঘরে ফিরতে লাগলেন।

আমার বাড়ির লোকের এতে কোন আপত্তি ছিল না। কেননা বড়সাহেবের হাত দিয়েই তো লোকের চাকরি ও প্রমোশন। কিছুদিন পরেই সাহেব জেনে গেল, মধুমতী গান জানে। ফলে একদিন মধুকে গান শুনতে হলো। প্রথমে ওর আপত্তি থাকলেও, আমার অনুরোধে শেষে, ও গান ধরলো। আমার জীবনপাত্র উছলি মাধুরী

করেছ গান।

গানের ভেতর দিয়ে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। মধুর স্বামী হিসাবে খুব গর্ববোধ করলাম। সাহেব গান শুনে বললেন: সুনন্দ, তোমার বৌ তো গুণী হে। একে লুকিয়ে রেখেছো কেন?

ব্যস, এতেই কাজ হল! মধু ক্রমে গলে যেতে লাগল। সাহেব মাঝে মাঝে আসতে লাগলেন। অফিসের প্রতিষ্ঠা দিবসে ডাক পড়লো মধুমতীর। গান গাইতে হবে। অফিসে ও পাড়ায় এসবের সুবাদে আমার খুব নামডাক হল। আমি এমন এক সম্পদের অধিকারী হিসাবে খুব গর্বিত বোধ করলাম।

একদিন কোথায় যেন [redacted] মধুমতী বললো, সুনন্দ আমাকে একটা হেন্ডার কিনে দাও না। ইদানীং দেখছি মধু আমাকে নাম ধরে ডাকছে। সে বড় মন্দ লাগে না। আমি হাসতে হাসতে বললাম, সে কী? তুমি কি আবার গান গাইতে শুরু করবে?

আমার দিকে দুষ্টুমিভরা আদুরে নয়নে চেয়ে আমার বৌ কপট অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, কি? আমার বুঝি গান গাইতে মানা?

বিষয়টা সিরিয়াস দিকে চলে যাচ্ছে দেখে, আমি ঈষৎ হেসে বললাম, আরে না, না আমার বৌয়ের গান গাইতে মানা করে এমন সাধ্যি কার? তবে...

—এর মধ্যে কোন কিন্তু তবে নেই।

—তাহলে?

—যেদিন পেলেই তুমি আমাকে হেন্ডার কিনে দেবে। আর পূজায় আমি কোন শাড়ি নেব না। ভাবছি পূজার পরেই ওস্তাদজীর কাছে ফের তালিম নেব।

এত কথা আমি তো জানি না। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। অফিসের বাইরে আড্ডা—চায়ের দোকান। এইসব নিয়েই চুর হয়ে আছি। মাঝে মাঝে ইউনিয়নের কাজ এখানে-ওখানে। ব্যস এই তো জীবন। এর মধ্যে ওস্তাদজীর দেখা নেই। তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ওস্তাদজী কে?

মধুমতী কপট অভিমানে আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললো তোমার না আজকাল কিছুই মনে থাকে না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে? খোঁচা খেয়ে আমি মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলতরুর উৎসবেতে এক ওস্তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ওর গান শুনে নাকি বলেছিলেন, বাঃ, বেশ মিষ্টি গলা। তালিম দিলে আগুন জ্বলবে।

আমার সবই মনে পড়ল ধীরে ধীরে। ফিরে আসবার সময় ট্যাক্সির ভেতর এরকম কত কী বলেছিল আমার সুন্দরী বৌ, মধুমতী। আমি পা এলিয়ে অফিসের ক্লান্তি দূর করার জন্য ট্যাক্সির জানলার ভেসে আসা বাতাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দুয়োরা-মতো মধুর কণ্ঠস্বর আমাকে ওস্তাদ দিচ্ছিল। আমি ভিড় বলেই অফিস থেকে কলতরুর মাঠে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বৌয়ের অনুরোধে ট্যাক্সি ঘুরে ঘুরে ফিরছিলাম।

মধু বলেছিল, শোনো, ওস্তাদজী আমাকে গান শেখাতে রাজি হয়েছেন। তুমি বললে আমি আবার গান শিখতে পারি। আমার গুণবতী বৌ মধুমতী এমনিভাবেই কথা বলে। যেন আমি না বললেও কিছুই করবে না। ওর এই আদো আদো কণ্ঠস্বরের ইতিতে আমার মনে পড়ে যায়। যেন এক কিশোরীর কথা। নবযৌবনের উচ্ছলতায় ব্যাকুল, সেই স্কুলপালানো কিশোরী পার্কের বেঞ্চিতে অধীর। এসব কথা মনে পড়তেই আমি খিক্ খিক্ করে হেসে ফেলি।

ট্যাক্সিটা ক্রসিংয়ে দাঁড়াতেই মধুমতী বললো, হাসছো যে? আমি বললাম, এমনি-একটা মনে পড়ে গেল, তাই—

মধুমতীর অকারণ কৌতূহল নেই শান্তভাবে মেনে নিল। বললো, কিছু বলছো না? আমি বললাম, কী বলবো। ও তখন স্মরণ করিয়ে দিলো ওস্তাদজীর কাছে গান শেখার প্রসঙ্গ। আমি বললাম, সে হবে।

হেন্ডার হারমোনিয়াম কেনার দুদিন পরেই ওস্তাদজী সদলবলে এসে হাজির হারমোনিয়াম কেমন হয়েছে দেখতে। ইতিমধ্যে আমি বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলাম। বাবা বললেন, ঘরের বৌ তাতে কী, গানই তো শিখবে! ওর যখন এত ইচ্ছে শিখুক না। এ ব্যাপারে আমার মায়ের আপত্তি ছিল।

শেষ পর্যন্ত ওস্তাদজী আমার মনের তলায় অবশিষ্ট দ্বন্দ্বটুকু মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, খুবই নরম গলা ওস্তাদজীর। আমাদের পাশের বাড়ির হিন্দুস্থানি, উনি তো রেডিওতে গান গায়। উনিও খুব তারিফ করলেন। বলে ওস্তাদজীর কাছে গানে শেখার সম্মতি দিতে হল।

প্রথম প্রথম ওস্তাদজী আমাদের ঘরে এলেও পরে তিনি প্রায়ই ডেকে পাঠাতে লাগলেন। তাই মধুমতীর সঙ্গীতশিক্ষা তাকে ক্রমেই ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে লাগলো। এ নিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে প্রায়ই মধুর সংঘাত ঘটতে লাগলো। প্রথম প্রথম আমি কিছু জানতেই পারিনি। বাবা সেসব সামলে নিচ্ছিলো। শেষে ওস্তাদজীর সামনে আমার বৌয়ের পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আমার মা। সুনন্দ, তুই কী কিছুই বুঝিস না?

আমি অফিস থেকে ফিরে আড্ডায় যাবো বলে তৈরি হচ্ছিলাম। বললাম, কী বুঝবো। সংসারের ভালোমন্দ বোঝার জন্য তো তোমরাই আছো, মা—

না, বাপু, তোমার বৌয়ের ব্যাপারে আমি নেই। তারপর মা, খুব হতাশ কণ্ঠে অনুযোগের সুরে বললো, বৌয়ের মতিগতি ভালো নয়...

একথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। বললাম, দূর! এই কথা ওসব তুমি কিছু ভেবো না, মা, সব ঠিক হয়ে যাবে—

ঠিক কিন্তু কিছুই হল না। মধুমতী ধীরে ধীরে আরো উদ্ধত আর অত্যাধুনিক হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে নিতান্ত ওর অভ্যাসে আমার চাকরিতে প্রমোশন হল। ইউনিয়নের কাজে আমি সন্দেহভাজন ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। কেননা বামপন্থী ইউনিয়ন করে কেউ আমাদের কোম্পানিতে এর আগে প্রমোশন পায় নি।

সত্যদা স্পষ্টভাষী। সেদিন ইউনিয়ন অফিসে কেউ ছিল না। সত্যদা বললেন, তোমার উন্নতিতে আমি খুশি হতে পারছি না। তুমি এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাও অন্যখানে তোমার সঙ্গে বড়সাহেবের মাখামাখি অনেকে ভালো চোখে দেখছে না।

আমি মৃদু আপত্তি করলাম, সত্যদা, আমি তো আপনার কথাতেই

চলি। ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত ছাড়া আমি কোন কাজই করি নি। গত বছর আমাকে তো আপনারাই নেতৃত্বে টেনে নিলেন। আমার বিরুদ্ধে কি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে?

'সত্যদা বেশি কথার মানুষ নন। শুধু মুখে বললেন, না।

আমি নিতান্ত ছাপোষা মানুষ। কোনদিনই সক্রিয় রাজনীতির মধ্যে নেই। এইসব গূঢ়, কূট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আমার চিন্তার বাইরে। এটা বুঝি আমাদের কোম্পানিতে ইউনিয়ন ছাড়া চাকরিতে টিকে থাকা খুব কষ্ট। সবত্র প্রাইভেট কোম্পানিতেই এই হাল। তাই সত্যদার কথায় আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কী বলতে চায় সত্যদা?

মাত্র কিছুদিন হল ইউনিয়নের গুরুত্ব বেড়েছে। আমি এখন আড্ডার বদলে ইউনিয়ন অফিসে বসি। সেখানে আড্ডা ও কাজ দুইই হয়। সন্ধ্যার পর এখানে অনেকেই আসে। নানারকম কথা হয়। মন্দ লাগে না।

আজ কিন্তু ভালো লাগলো না। লোকজন সবে আসতে শুরু করেছে। আমি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে 'সত্যদা যাই' বলে বেরিয়ে পড়লাম। পেছন থেকে কেউ বললো, উঠে গেলো! শ্যালা, বড়সাহেবের চামচে—

কথাটা এমনই অন্যায়ীন আর অনর্হিত যে আমার ফিরে গিয়ে প্রতিবাদের ইচ্ছা হল। কিন্তু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত বদলে নিলাম এইজন্য যে বড়সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কের চাবি তো মধুমতীর হাতে! তবে পিউরে উঠলাম, হয়তো মধুর সম্পর্কেও এরা কলঙ্ক টেনে দেবে।

ঘরে ফেরার দেরি ছিল। তাই একবার ভেবেছিও যাব কিনা ভাবছিলাম। কেননা, এইসময় আমার ঘরে মধু নেই। আজ মধুমতীর গুরুজীর কাছে যাবার কথা। ওকে একটা সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছে জাগলো মনে। ঘড়িতে তখন সাতটা বাজতে কুড়ি।

তাই তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সুনন্দ মধুমতীকে গুরুজীর ঘর থেকে তুলে নিতে চাইলো। রাতে এই অঞ্চলটা বেশ আলোকিত। কেমন জেন মায়াবী মনে হয়। নানা আলোর রোশনাই কেমন কাছে ও দূরে। একটা মায়ার সৃষ্টি করে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুনন্দ গুরুজীর গান ঘরে পৌঁছলো।

বাড়িটার নাম মায়াভবন। সুনন্দ মনে মনে গুরুজীর রসবোধের তারিফ করলো। গান তো মায়াই সৃজন করে। তাই এ নাম যথার্থ। নাকি গুরুজীর স্ত্রীর নাম মায়া? কে জানে!

সাতটা বাজতে দেরি নেই। তাই সুনন্দ তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থেকে নামলো। সাধারণত সাতটার পরই মধুমতী এখান থেকে বেরিয়ে যায়।

একতলার হল ঘরটি ফাঁকা। মানে আসর ভেঙে গেছে। এত করেও সুনন্দ শেষ রক্ষা করতে পারলো না। তাড়াতাড়ি আসবে বলেই তো ট্যাক্সি নিয়েছিল। যা হোক, একবার ওপরে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসবে নাকি?

সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে গিয়ে দরজার হাত রাখতেই দরজাটা খুলে গেলো। মধুমতীকে চমকে দেবার বদলে এবার সুনন্দই চমকে গিয়ে নিচে নেমে এলো। কিছুক্ষণ পর, পিছু পিছু আলুথালু মধুমতীও নিচে নেমে এলো।

ট্যাক্সিতে কোন কথাই হলো না দুজনের। ঘরে ফিরে গভীর রাতে বিছানায় সুনন্দ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো। কাজটা তুমি ঠিক করলে মধু?

সংসত মধুর ভেতরে অন্য আরেকজন মধু যে গড়ে উঠেছিল তা সুনন্দর জানবার বাকি ছিল। উত্তর পেলো না কিন্তু। মধু বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে, অনুতপ্ত। ভাবলো সুনন্দ।

কয়েকদিন পরে মুখ খুললো মধু। যে আর গান শিখবে না কিউটি পার্লার ট্রেনিং নেবে। কিউটিপার্লার খুলবে। সুনন্দের আপত্তি ছিল তাতে। কিন্তু কিছুই মধু শুনলো না।

এখন চারিদিকে ভোগ আর সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। মুক্ত বাণিজ্যের উদার অসভ্যতা জনেই সারাবিশ্বে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে। এইসব বাচ্চাদের নাম, কিউটিপার্লার কিন্টার গার্টেন, ফ্রেশ, ফ্যাসন কনটেস্ট, কিউটি কনসেস্ট। সর্বত্র নেমে আসছে বেসরকারীকরণ ও অটোমেশনের কৌক সুনন্দদের চাকরি যাবার অবস্থা। কেননা অর্ধেক দামে কমপিউটার এসে দখল করে নিল একাধিক কেরানীর চেয়ার। ছাঁটাই হল অনেকে। আরো অনেকে উদ্বৃত্ত ঘোষিত হল।

এরই মধ্যে সুনন্দদের একটা মেয়ে হল। তার নাম রাখা হল মিরান্ডা, পেপসিও রাখা যেত। কেননা এখন সেটাই সবচেয়ে আধুনিক। বাড়ির অভিভাবকদের দেওয়া নাম নিতান্ত ব্যাকডেটেড। এমন কি সুনন্দের আপত্তিও ধোপে টিকলো না। কেননা তখন কোম্পানিতে ধর্মঘট চলছে। বেতন বন্ধ। স্ত্রী কিউটিপার্লার : 'ট্রিমন্ড্যান্ডের টাকায় তখন ওদের গ্রাসাচ্ছাদন।

এই সময় সুনন্দকে ব্যাপক শ্রমজীবী ঐক্যের সন্ধানে পথে পথে মিছিল আর সমাবেশ করে ফিরতে হচ্ছে। বাড়ির দিকে নজর দেবার সময় কোথায়। বাবা ও মার দেখাশুনো, মিরান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ, সবই সামলাচ্ছে পরিশত বয়, মধু। এখন সবদিক থেকেই গোপাকে-পরিচ্ছন্নে, আচার-ব্যবহারে, উগ্র নারীত্বে আর স্বাধীনতায় সে বড় আধুনিক, ভোগবাদের প্রবল সমর্থক, মার্কিন ইয়ং লেডির সমান। শুধু তার মুখের ভাষা : বাংলা, জন্ম : নিশ্চিতপুরে।"

এখন সুনন্দ ব্যক্তিগত জীবনে দারুণ অসুখী। প্রাইভেটাইজেশন কত নির্মম হতে পারে সে জানে। এমন কি তাকেও বড়সাহেব মানে ম্যানেজমেন্ট উদ্বুদ্ধ হতে পারে সে জানে। এমন কি তাকেও বড়সাহেব মানে ম্যানেজমেন্ট উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছে। সেও যে শ্রমিকনাম, সংখ্যানাম উৎপাদনের নিমিত্ত নাম এ সত্য অনুধাবন করতে তার আর বাকি নেই। তাই সে সবার সাথে দাঁড়াইয়ে নেমেছে। ধর্মঘটের সমর্থনে পোস্টারিং, সভা, স্লোগান এমনকি দূর কোন স্থানে গোপন সভায় যেতেও তার বিশেষ আপত্তি নেই।

এখন সে বেশির ভাগ দিনই অনেক রাতে ঘরে ফেরে। অনেকদিন খুব সকালে কেউ এসে তাকে ডেকে তুলে নিয়ে যায়। কোথায় কী মিটিং, কোথায় মিছিল এইসব নানা প্রয়োজন। আন্দোলন তীব্র হলে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে ধর্মঘট উঠে যায়। মালিক বড়সাহেবকে সাসপেন্ড করে বসিয়ে দিলেন। কর্মীদের কিছু দাবি মানা হয়। কিন্তু যা মানার প্রতিশ্রুতি। তার যে কী হল তা ঠিক সুনন্দের মাথায় এল না। তবে তার চাকরিটি গেল না। আর একটা অদ্ভুত সুখের অনুভূতি তার মধ্যে বিস্তৃতা নিয়ে এলো। বহু মানুষের মধ্যে কাজ করতে সুনন্দ দেখলো তার মধ্যে আরেকজন সুনন্দ জন্ম নিয়েছে। সে এখন রাশিয়ার পাভেলের মতো অপ্রতিরোধ্য জীবনসৈনিক।

রাজলক্ষ্মী

স্বপ্না ঘোষ

"জনস্রোতের মাঝে যেন হারিয়ে গেছি আমি।" অবাক হয়ে ভীড়ের মধ্যে চলতে চলতে রাজলক্ষ্মী এই কথাটিই ভাবতে থাকে। স্কুলের সহকর্মীবৃন্দের সাথে এসেছে এই হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়, জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে আপনা-আপনিই চলছে, থাকবার অসুবিধা হয়নি। মজুমদির জন্য। ওনার ছোট্ট বাড়ী আছে এখানে, সেখানেই উঠেছে, চারিদিকে রাজলক্ষ্মী চাইতে থাকে, উফ্ ভীড়। মানুষ যেন উপচে পড়ছে মনে হয়। ভারতবর্ষের যত মানুষ ছিল, সবাই যেন এখানে এসেছে, বহুলোকের সমাগমের ভিতর ভগবানের আবির্ভাব, "তাই? নিজেকেই প্রশ্ন করে, তাই। ভগবান বস্তুটিকে এখনো চিনতে পারেনি, তিনি কোথায় থাকেন? হৃদয় হৃদয়ের মধ্যেই অধিষ্ঠান অথবা মানুষের কর্মে? কোথায়?

মনীষাদি চেঁচাতে থাকেন, "এাই রাজলক্ষ্মী, আমি যে হারিয়ে যাচ্ছি ভীড়ের চাপে, কাকলি কোথায়?"

রাজলক্ষ্মীর সম্বিত ফেরে, ভীড়ের মধ্যেও জায়গা করে পিছতে থাকে, তারপর মনীষাদির হাতটি ধরে বলে, কাকলি কোথায়? তোমার সাথেই ছিল তো? তিনজনেই স্নানে চলেছে; মজুমদির বাড়ী থেকে বেরোয় যখন তখন ভোর সাড়ে চারটে, শীতের সময়, চারিদিকের কুয়াশায় সমানের মানুষ ও দেখা কষ্ট, কুয়াশা ছাড়াও চারিদিক অন্ধকার; হর-কি-পিয়ারীর ঘাটে চান করবে, মকর সংক্রান্তির পূণ্য উষা লগ্নে স্নান, কষ্ট মানুষ এসেছে। নিজেদের মানুষ-জনদের খুঁজতে কেউ কেউ জোরে জোরে ডাকছে, আবার মাইকেও ঘোষণা হচ্ছে, রাজলক্ষ্মী, "মনীষাদির হাতটি ধরে, ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে; এক কালের অ্যাথলেটিক্স করা শরীর। সামনেই বিড়লা সাট্; একটা গাছের নিচে দাঁড়ায়। তারপর বিড়লা সাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, জলে আর, খেয়েনেই আমরা চান করবো, হর-কি পিয়ারীতে যাব না, একই কথা বার, বারে জোরে বলতে থাকে, মিনিট পাঁচ পরে কাকলি এসে দাঁড়ায়, উফ্ কি ভীড়, আমি, তো মনীষাদির সাথেই আসছিলাম, তারপর আর মনীষাদির দিকে দেখতে পাইনি, ভাগ্যিস্ দুজনে চেঁচাচ্ছিলাম, তাই শুনতে পেলাম।"

রাজলক্ষ্মী বলে, "বেশি পুণ্যের দরকার নেই, এইখানেই স্নান সেরে নেই, মনীষাদিকে নিয়ে ওত ভীরে যাব না; অসুস্থ মানুষ, শুধু জলাদের তাগিদে এসেছেন। মজুমদি কতবার বারণ করেছেন, ভীড়ে না যেতে, চল স্নান করে, তারপর গরম চা, জিলপি খাই"।

মনীষাদি বিড়বিড় করে বলেন, "আর খাওয়া, এত ভীরে এখুনি চিড়ে চেপ্টা হচ্ছিলাম। বুড়ো বয়টাকে কে দেখতো বল!"

কাকলি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আমি যে আমার বাচ্চা মেয়েকে ছেড়ে এসেছি! আমার বর কি রকম রাগী সেতো জান! একটু এদিক থেকে ওদিক হ'লে মেয়েটাকে যা বকে, মাত্র দশবছর বয়স, তার তো খেলার দিকে মন থাকবেই, সেকথা যদি বলি, মহা রেগে ওঠে বলে, আমার আস্তারায় মেয়ের লেখাপড়া হবে না, বোঝ তোমার, কি লোক নিয়ে যে ঘর করি।"

রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়; কিন্তু সে হজম করে ফেলে। নিজের শূণ্য জীবনের হাহাকার কাউকে জানতে দিতে চায় না। মজুমদি যেমন একা নিঃসঙ্গ, তেমন রাজলক্ষ্মীও। দুজনেরই সব ছিল, কিন্তু এখন নেই, আর ভবিষ্যত? জানে না, তবুও মজুমদির একটা দিক আছে, সারদা মঠের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। ওই নিয়েই বেঁচে আছেন, আর রাজলক্ষ্মী? কারুর সাথেই নিজেকে জড়ায়নি, চায়ও না। শুধু স্কুলের এই চাকরী। তারপর কি হবে জানে না রাজলক্ষ্মী।

মনীষাদি রাজলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বলেন, "কি রে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইছিস কেন? চল সেরে চল চা খেতে যাই।"

রাজলক্ষ্মী হেসে বলে, উফ্ কি ঠাণ্ডা জল! কি করে যে জলে নামবো! ভয় করছে, ও, ও বাবা, এই দেখ শীতে কেমন কাঁপছি, বয়স বেশি হলে বোধহয় ঠাণ্ডা বেশি লাগে তাই না মনীষাদি?"

মনীষাদি—"বয়সের আছে মশাই গল্প? আমি অন্তত দশ বছরের বড়। কবেসির কথা বার দে, তোর আর কত হবে? বড়োজোর বিয়াল্লিস? আর আমার? সামনের বছর রিটায়ার করব। ৬০ বছর হবে।"

রাজলক্ষ্মী বলে, "আচ্ছা মনীষাদি তুমি প্রায়ই বল আমার বয়স বিয়াল্লিস, কেন? বাহাত্তরে দশবছর কমিয়ে বেয়াল্লিস বলতে তোমার ভাল লাগে?"

মনীষাদি বলেন, "চল্, চল্, খা চালা, কত সিঁড়ি ভাঙতে হয় তাই না?"

কাকলি, "তিনজনেই একসাথে চান করবো?"

রাজলক্ষ্মী—"সে কি করে হবে? জামা কাপড়ের ব্যাগটা রাখবো কোথায়? কে দেখবে?"

কাকলি, "তুমি আর মনীষাদি আগে চান করে এসো, তারপর আমি করবো, কি ভীড়? কোথায় দাঁড়াবো?"

রাজলক্ষ্মী ঘাটের পাশে দেয়াল দেখিয়ে বলে, "এই পাশে দাঁড়া, এখান থেকে নড়বি না, যদি তোর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, তুই ও জোরে ধাক্কা দিবি, জানিস তো জোর যার মুলুক তার।"

বিড়লা সাটেও উপচেপড়া মানুষের ভীড়, তার ফাঁকে ফোকরে মনীষাদির হাতটি জোরে ধরে, জলে নামে। সারা শরীর বরফ ঠাণ্ডাজলে পা থেকে শরীর অবশ হয়ে যেতে থাকে; চারিদিকে তাকায় কত পুরুষ, মহিলা

বাচ্চাকে নিয়ে এসে ডুব দিচ্ছে। নিজেদের সাহস বেড়ে যায়, সারা দুজনে এক সাথে ডুব দেন। পর পর তিনবার দেবার পর সুস্থ প্রশান সেরে কাকলির কাছে আসেন, কাকলির ভয় পেয়ে যায় সবার চোখে-"ওরে বাব্বা, শীতে মরে যাবো।"

মনীষাদি বলেন, "দূর! স্নানের আগেই ভয়, একবার ডুব দিয়ে উঠলে, আর ভয় থাকে না। সারা শরীর শীতল হয়ে যায়। কি আরাম! বোঝাতে পারবো না।"

কাকলির দিব্যিদের ভরসায় স্নান করতে যায়।

প্রভাতের লাল সূর্য্যের আবছা আবির্ভাব সমস্ত পরিবেশকে ঝলমলে করে তোলে। পাখীদের কলতান ছাপিয়ে, কথামানুষের কোলাহল পরিবেশকে এনে দেয় এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য।

চারিদিকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করছে, রোদের দেখা পেতে এখনো দেরী আছে; তা সত্যেও চারিদিকে আনন্দের কলকাকলির আলো ছড়ানো।

দুজনের কাপড় ছাড়া হয়ে গেলে, অপেক্ষা করছেন কাকলির জন্য, ঘাটে তিন চারটে সিমেন্টের বেঞ্চ আছে, কত মানুষ বসে আছে, বসবার জায়গার অভাব, ওনারা দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ এক ভদ্রলোক রাজলক্ষ্মীর সামনে এসে দাড়ান। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "মাফ্ ভাল আছ?"

রাজলক্ষ্মী অবাক চোখে চেয়ে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে কে? তারপর চিনতে পারে, শরীরের ভীতর কাঁপতে থাকে, চোখের জল এসে যেতে চায়, অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলে, "আপনি ভাল আছেন?"

আপনি, "সম্বোধনে ভদ্রলোক হতচকিত হয়ে যায়, তবুও সামলে নেয়, বলে, "হ্যাঁ" কোথায় উঠেছো তুমি?"

মনিষাদি বলে ওঠেন, "ওই যে সারদা মঠের পাশে রাজলক্ষ্মীর মজুমদির বাড়ী। জায়গাটার নাম সপ্তর্ষী সবাই বলে দিলেন মনিষাদি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করে থাকে। এবার আবার পরিমল বলে, "আজ সন্ধেবেলায়, নাহ্ বিকেলেই যাব আপনাদের আছে, আমি উঠেছি এই সপ্তি সেরে, ওজরাল ভবনে, এই একেবারে কাছে, চলুন না, চা খাবো সবাই একসাথে। পরিমল মনীষাদির দিকে চেয়ে বলে।

এমন সময় কাকলি আসে, স্নান সেরে, কাকলি চায়ের আমন্ত্রণ শুনতে পায়, খুশি হয়ে বলে, "বিদেশে বাঙালীর বন্ধু, এই যেমন না আপনাকে তেমন চিনি না, তবু পরিচয়, একমাত্রই আপনি চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন।"

পরিমল হাসিমুখে বলে, "আপনাকে চিনি না, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার অনেকদিনের চেনা, তাহলে সবাই সামনের দোকানে একসাথে চা খাবো, গঙ্গাস্নানের পর, পুণ্যটা আমাকে করতে দিন, চলুন সবাই।"

রাজলক্ষ্মী মৌনই ছিল এতক্ষণ, এবার সে বলে, ওরা থাক্ আমি বাড়ী যাই, দরকার আছে।"

কাকলী, মনীষাদির দুজনেই চেঁচিয়ে ওঠেন, "সেকি। এইতো একটু আগে চা, জিলাপী, কচুরী খাবার কথা হচ্ছিল, তা হলে? না, না সবাই চল।"

পরিমলের সাথে যেতে থাকে সবাই।

বুদ্ধিমতী মনিবাদি সবই বুঝতে পারেন; উনিই একমাত্র জানতেন রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা। বুঝতে পারেন এই সেই পরিমল, যিনি সন্তান ধারণের অক্ষমতার জন্য রাজলক্ষ্মীকে ডিভোর্স করেছিলেন। পূর্ব স্বামী। চুপচাপ সবাই চলতে থাকেন। কাকলি কিছুই জানে না, সুতরাং তার বকবকানি সমানেই চলতে থাকে। এর মধ্যেই সে পরিমলের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলে।

রাজলক্ষ্মীর পা চলতে চায় না। নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে, কেন সে এখনও পরিমলকে মনে রেখেছি। দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে পরিমল। ওদের বিবাহিত জীবন ছিল মোটে আটবছরের, সেই আট বছরের স্মৃতিগুলি বার বার ফিরে আসতে থাকে। সেই বিয়ে হ'ল, কাগজ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, ছয় ভাই বোন, বাবা, মা, চার মেয়েকে বিয়ে দিতে প্রায়ান্ত অবস্থা বাবার, তবে বড়দা, চার বোনের বিয়ে দেবার খরচ, তবে বিয়ে করেছিলেন। বৌদিকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে; মায়ের শেষ টুকরো টাকরা যা গয়না ছিল, সব ছোট মেয়ে রাজলক্ষীর বিয়েতে শেষ হয়ে যায়। পরিমলদের তরফ থেকে কোন দাবী দাওয়া ছিল না, কিন্তু মেয়ে যেন সুশ্রী হয় অথবা সুন্দরী হয়। তা রাজলক্ষ্মী দেখতে ভালই ছিলেন, সে কথাই সবাই বলে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন দোকানের সামনে দাঁড়ায় সবাই, রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি চারণ ও হয়ে যায়। রাজলক্ষ্মী হাঁ করে চেয়ে থাকে মনীষাদির দিকে, মনীষাদি চোখের ইশারায় ওকে শান্ত থাকতে বলেন; রাজলক্ষ্মীর হাসি পেয়ে যায়, শান্তই তো আছে রাজলক্ষ্মী চিরকাল; যখন ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এনার ত্রুটির জন্যই সন্তান হচ্ছে না, তখন থেকে একেবারেই শান্ত থেকেছে। তারপর কত ঘটনা ঘটে গেল জীবনের উপর দিয়ে, সে সময় ও শান্ত থেকেছে। বড়দার চেষ্টায় এই স্কুলের চাকরীটি যদি না জুটতো তাহলে কি হতো? এখনো ভাবতে ভয় হয়, কি হ'ত? হয়ত ভগবান অদৃশ্য থেকে দাদার মাধ্যমেই সাহায্য করে যাচ্ছেন। এখন সেসব কথা আর ভাবতে ভাল লাগে না। পরিমলই একতরফা ডিভোর্স করেছিল। আর ডিভোর্স পেতে ও অসুবিধা হয় নি, খোরপোষ দিতে চেয়েছিল পরিমল, রাজলক্ষ্মী নেয়নি, নিজের নামের জন্য কি লজ্জাই না পেতো?

রাজলক্ষ্মী নাম বাবাই দিয়েছিলেন, দোকানে বসেও পূর্ব্ব কথা মনে এসে ভীড় জমাচ্ছে, বাস্তব যেন কোথায়? কাকলি চেঁচিয়ে বলে, "কি হ'ল রাজলক্ষ্মীদি, তুমি কি খাবে? আমরা চা কচুরী আর জিলাপী নিচ্ছি, আর তুমি?"

রাজলক্ষ্মী বলে, "শুধু চা আর কিছু না।"

মনীষাদি রেগে বলেন, "আচ্ছা মেয়ে তুই, ভোরে কি বলেছিলিস? আর এখন শুধু চা? আমরা যা খাবো তুইও তাই খাবি"। বলে পরিমলের দিকে চান।

পরিমল সবার জন্য একইরকম খাবার দিতে বলেন, বয়কে;

খাবার খেতে খেতে এই হরিদ্বারের কথাই বলে চলেন মনীষাদি। এর আগেও অনেকবার এসেছিলেন, স্বামী আর উনি। সন্তান নেই, হয়নি, এখানেই আসতেন ছুটিছাটায়।

পরিমল—"আপনার স্বামীও আপনাদের সাথে এসেছেন?

মণিষাদি—"মাথা খারাপ? এই ভীড়ে ওনাকে আনি আমি? এবার ওঁকে ননদের জিম্মায় রেখে কুম্ভমেলায় এসেছি। পুণ্য-স্নান, তা হ'ল স্নান ভালই হয়েছে, স্নান করতে ভয় পাচ্ছিলাম তারপর স্নান শেষ হতে খুব আরাম লাগলো বুঝলেন, বলে পরিমলকে জিজ্ঞাসা

করেন, আপনি ও কি স্নান সেরেছেন? সঙ্গে কেউ আছেন, না একাই এসেছেন?"

পরিমল—"আমি মাঝে মাঝে এভাবে একা বেড়িয়ে পড়ি, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে, তারপর নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াই, এটাই আমার নেশা।"

কাকলি—"আপনার স্ত্রী নেই? নাকি একাই পুণ্যকরেন। আর তাকে বোধহয়, পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্য তাই না?"

পরিমল—"নাহ্ তিনি জীবিত নেই, সন্তান প্রসবের সময় মারা যান, সে অনেকদিন আগেকার কথা, আমার এক মাত্র কন্যা সন্তান; তার ও বিয়ে হয়েছে, এই মাস তিন হবে। মেয়ের জন্য বেড়ানোতে একটু বাঁধা থাকত, এখন একেবারে স্বাধীন। চাকরীতে আর একবছর আছি, এরমধ্যে ছয়মাস ছুটি নিয়েছি, এখনো তিন মাস সময় হাতে আছে।"

মণীষাদি জিজ্ঞাসা করেন, "মেয়েকে কে মানুষ করলেন?"

পরিমল,—"কেন আমার মা? আমি মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম, সেজন্য মা একটি বাচ্চাকে চেয়েছিলেন, তা বাচ্চার না হয়ে বাচ্চাকাকী অর্থাৎ মেয়ে হয়েছিল। মা যখন মারা যান, রঞ্জনা তখন বারো বছরের মেয়ে, তারপর বাপ বেটিতে অনেকদিন পাঠশালায়। M. A পড়তে পড়তে ওর বিয়ে হয়ে গেল। জামাই কলকাতায় চাকরী করে, পরে হয়ত বদলী হবে; শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর ননদ সবাই আছে। মনে হয় বাড়ীতে বেশি লোকজন থাকায় মেয়ে খুশী। ছোট থেকে বড়ই একা মানুষ হয়েছে, সেই জন্যই বোধহয়;"

নিস্তব্ধ রাজলক্ষ্মী, শুধু দেখে যান, কিন্তু কান থাকে বধির, এত যে কথা চলাচলি, তার মধ্যেও বধির। শুধুই পিছন ফেরা স্মৃতির দরজাগুলি এক এক করে সশব্দে খুলে যেতে থাকে ;

বিয়ের রাত, আবার যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, ফুলশয্যার রাত, পরিমলের মুগ্ধতা ও শারীরিক ব্যাকুলতা, সব কিছুই ছবির মত ভাসে,তারপর ঘরের মত ঘুমঘর পার হয়ে যায়। মাকে পুরীও বেড়িয়ে আসে, জীবনের সুখের ছবিগুলি এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেন কি করে? পরিমলের চোখে হারাই হারাই ভাব ছিল বিয়ের ওই দুটি বছর। তারপর শাশুড়ী মারা যাবার পর থেকেই ধীরে ধীরে পরিমলের নুড়তার ছুটি যেতে থাকে, সেও খুবই ধীরে ধীরে আট বছরের বিবাহিত জীবনে শেষ তিন বছর বড়ই কষ্টে কেটেছে, রাজলক্ষ্মীর। দু, তিনবার অপারেশন, তারপরও বিভিন্ন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে, সীমিত আয় পরিমলের, ব্যয় হতে থাকে জলের মত, শাশুড়ী এবার তার ধর্মের বাঁধ ভেঙ্গে, উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আর খরচ নয়, এ বৌ বাঁজা, সুতরাং ত্যাগ কর পার, ত্যাগ কর। ছেলেকে পার বলেই ডাকতেন। তারপর তো মামার কাছে চলে এসেছিলেন রাজলক্ষ্মী, স্কুলের চাকরী, বাঁচবার পথ দেখিয়েছিল। এখন যেন জীবন বড় বেশী ভার হয়ে উঠছে ক্রমশ।

এতক্ষণ তিনজনের গল্প চলছিল, রাজলক্ষ্মী কিছুই শোনেনি, এবার কান পাতলেন ওদের কথায়, মণীষাদি বলছেন, 'আজ রাত্রিবেলায় আমাদের কাছে খাবেন, কাল আমরা একসঙ্গে হৃষিকেশ যাব।'

কাকলি—"পরিমলবাবু, আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে আসবেন, মঞ্জুদি যে গাড়ি ভাড়া করেছেন, সেটা সকাল ৭টায় ছাড়বে, আরো দু'জন পরিবার আমাদের সাথে যাবেন।"

পরিমল হাসতে হাসতে বলেন, "আপনারা দু'জনে অনেক কথা বলছেন, পরিকল্পনাও করছেন, কিন্তু আপনাদের অপর সঙ্গিনী তো চুপ করেই আছেন, তিনি কি বলতে চান এতবার জিজ্ঞাসা করুন?"

মণীষাদি—"রাজলক্ষ্মী? ও বরাবরই খুব ঠাণ্ডা মেয়ে, সেই জন্যই বোধহয় অনেক কষ্টো ওকে সইতে হয়েছে, ও যাবে আমাদের সাথে।"

মণীষাদি ঠিক সময় ঠিক কথা বলবার জন্য, পরিমলের মুখ মলিন হয়ে যায়। এবার চুপচাপ সবাই হাঁটতে থাকেন মঞ্জুদির বাড়ির দিকে।

কাকলি—"পরিমলবাবু ওই তো আপনার ওজরাল ভবন।"

পরিমল অনুরোধ করেন ওনাদের ওজরাল ভবনে যাবার জন্য। কিন্তু মণীষাদি রাজি হন না, বলেন সে কথা।

মঞ্জুদি হয়ত ভাবছেন আমাদের দেরী দেখে। গল্পে গল্পে সময়টা পেরিয়ে গেল। এবার পরিমলের দিকে চেয়ে বলেন, আচ্ছা ওই কথাই রইল, আজ রাতে আমাদের ওখানেই খাচ্ছেন? একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। রাজলক্ষ্মীর গান শুনবেন, ভারী সুন্দর গান করে।"

এবার রাজলক্ষ্মী মুখ খোলে, "তোমরা এতক্ষণ বেশ চালাচ্ছিলে, এবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন বল তো।"

মণীষাদি রাজলক্ষ্মীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "আচ্ছা, গাইতে হবে না তোকে।"

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে যায়, পরিমল এবার ফিরবেন, শীতের রাত বলা, বেশ ভালই রাত, কিন্তু কুম্ভমেলার জন্য লোক চলাচল ভালই।

মঞ্জুদিকে দেখলেন পরিমল, সাধারণভাবে বেশ ভালই বলেই মনে হল, কিন্তু মণীষাদিকে যেন বুঝতে পারছিলেন না পরিমল, মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে মিষ্টি হেসে কথা বলছিলেন, মনে হয় ভদ্রমহিলা সবই জানেন। তবে রাজলক্ষ্মী বড়ই চুপচাপ, কেন এত চুপচাপ? সদ্য বিয়ের সেই উচ্ছল মেয়ে যেন হারিয়ে এক মৌন সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত। সত্যিই, রাজলক্ষ্মীকে দেখে কেবলি আগেকার কত তুচ্ছ ঘটনা যেন মনে পড়ে যায়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে পুরীতে যাওয়া, ওখানে যখন তখন সমুদ্রের সাথে খেলা, বসি নিয়ে পরস্পরের ছোঁড়াছুঁড়ি, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বালুরাশিতে বসে গান, গান ভালই গাইতো, কিন্তু আজ অনেকের পেড়াপিড়িতে বা অনুরোধে যে গান শোনালো রাত্, একি ভোলা যায়? যায় না কি যেন গানটি ; এই করেছে ভালো নিঠুর হে, এই করেছ ভালো। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালা", তারপর আর মনে পড়ছে না, এবার বাড়ী ফিরে একটি গীতবিতান কিনব, কি সুন্দর গলা! এতো ভাল গলা তো ছিল না রাত্নর। কত নাম ধরেই না ডাকতো, রাত্, রাণী, লক্ষ্মী কত নাম, হারিয়ে গেছে, কোথায় তবে কেন হারিয়ে গেল, মাকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই, নিজেও কম দোষী ছিল না, নিজেরও সন্তান কামনায় অস্থির হয়ে ওঠা, নিজের শারীরিক ত্রুটি না থেকেও সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত রাখা নিজেকে, এটা নিজের মন মানতে চায়নি, তারপর সেই বেদনাময় রাজলক্ষ্মীর চলে যাওয়া। তারপর শান্তার আবির্ভাব, মা পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছিলেন,

খুব গরীব ছিলেন শান্তার বাবা, মায়ের বহু দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন, কি করে যে মা ওদের খবর পেয়েছিলেন, এখনো সে খবর অজ্ঞাত পরিমলের কাছে। বিয়ের পর দু'বছর বেঁচে ছিল শান্তা। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। এখনো মনে হয় পরিমলের, নিজেদের দোষের জন্যই শান্তা এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। শান্তার গায়ের রং কালো, কিন্তু তার মধ্যেও শ্রীময়ী ছিল, আবছা এখনো একটু মনে আছে, আর শান্তা ও পরিমলের একসাথে তোলা ছবি। সেও মনে পড়িয়ে দেয়। হঠাৎ মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়, রঞ্জনা? রাজলক্ষ্মীর সাথে নামের মিল দিয়ে নাম রেখেছিলেন রঞ্জনা। বাড়ীতে অবশ্য নানুপি বলেই ডাকেন। মা ডাকতেন, উনিও তাই ডাকতেন, আবার মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। মেয়ের সাথে জামাই সৌরভকে কি সুন্দর মানিয়েছে, নিজের মনেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ওরা যেন সুখী হয়, দীর্ঘজীবি হয়, আর কোন প্রার্থনা নেই ওনার জীবনে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া মিটে যেতে, আর পরিমল চলে যাবার পর, সবাই শুতে যায়, একটা বড় খাটে তাতেই সবাই শুয়ে বসে গল্প আরম্ভ হয়, প্রথমে কাকলিই কথার সূত্রপাত করে, রাজলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বলে, "দেখ রাজলক্ষ্মীদি, আজ সকাল থেকে তোমার ব্যবহার আমাকে অবাক করেছে। আচ্ছা তুমি পরিমলবাবুকে দেখবার পর থেকেই একেবারে চুপ, এঁ্যা! তোমার বহুদিনের চেনা, তার সাথে এত উদাসীন ব্যবহার কি করে করতে পারলে? সত্যি তোমার ব্যবহার মনে পড়লেই আমার লজ্জা করছে ভদ্রলোক কিভাবে তোমাকে দেখছিলেন, আর তুমি?"

নন্দুপি বলে ওঠেন, "ওতো তবু উদাসীন ব্যবহার করেছে, আর আমি হলে কি করতাম? আমি হলে, হাতে যদি লাঠি থাকত তবে পেটাতাম, আমার বাড়ীতে তোরা আগেই নিমন্ত্রণ করলি, বাধ্য হয়ে আমি ভদ্রতা করলাম, তোদের মান রাখলাম।"

রাজলক্ষ্মী বলে ওঠে, "চুপ কর নন্দুপি, এখন এসব কথার দরকার কি? ২৫ বছরের যবনিকার অন্তরালের মলিন স্মৃতির ধুলার ধূম্রে লাভ আছে।"

নন্দুপি নিজের মনেই বলতে থাকেন, "নাহ্ লাভ নেই, নিজের জীবন দিয়েই তো দেখলাম, তবে এটুকু বুঝেছিলাম, মেয়েরা বড়ই অসহায়, মায়া, মমতা, এগুলি কেন যে ভগবান কেবী নিয়ে যেন মেয়েদের জন্মের সময়, সেই জন্যই আমার কষ্ট, কেন? কেন ভগবানের এত এক চোখামী, পুরুষের বেলায় তিনি যোলহয় অন্ধ। এসব জিনিষ কম দিয়ে, পুরুষদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এবার মণীবাবি মুখ খোলেন, "মেয়েদেরও দোষ অনেক আছে ; আমি তো দেখছি ঘরে ঘরে, মেয়েরাও কি অন্যায় করে চলেছে, এখনকার সময়ে, বিবাহিত পুরুষরা অনেক সহ্য করছে, আমার দেখা এরকম অনেক ঘটনা জানা আছে। মেয়েরা যদি আর্থিক দিক দিয়ে একটু সক্ষম হয়, তবেই কেল্লা ফতে। সবাইকে, বিশেষ করে স্বামী এবং তার আত্মীয়স্বজনকে অবজ্ঞা করে চূড়ান্তভাবে।"

নন্দুপি আর থাকতে পারেন না, মণীবাবির দিকে চেয়ে বলেন, ঠিক আছে আপনার কথা মানলাম, কিন্তু রাজলক্ষ্মী বা আমি কি দোষটি করেছিলাম। রাজলক্ষ্মীর বড়দিদি আমার ক্লাসমেট ছিল, সুতরাং ওদের সব খবর আমি জানি। মিনতি মারা গেছে আজ দশ বছর হল। ও সুখীই ছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী? তার শারীরিক ত্রুটির জন্য বাচ্চা হয়নি, সে জন্য রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করে ভদ্রলোক আবার বিয়ে করলেন, যদি এই ত্রুটি ভদ্রলোকের থাকত? তখন কি হত? রাজলক্ষ্মী কি সন্তানের বাসনায় ভদ্রলোককে ত্যাগ করত? নাহ্ কখনোই না, মেয়েরা যে পারে না কেবী নিষ্ঠুর হতে, কিন্তু ছেলেরা পারে এবং পারছে, ভবিষ্যতেও পারবে, বলেছি না ভগবানের অভিশাপ আছে মেয়েদের উপর, পুরুষ তো ভগবানের পুত্রিপুত্র। আমি? আমার অবস্থা কি এরকম হবার কথা? আমার স্বামীর মেয়েঘটিত দোষ, আমি ওনাকে ত্যাগ করেছি, তবে সহে ছিলাম প্রায় উনিশ বছর। বিবাহিত জীবনের সেই দিনগুলি আমি এখনো ভুলিনি, তবে ভুলতে চেষ্টা করছি। এখন মনে হয় পারবো। ঠাকুর ও শ্রীনারায়ণ করুণায়। বহু বছর এবং হরিদ্বারে থাকি, এখানকার মঠে আশ্রয় করি, যৎসামান্য পাই, তাছাড়া বাবা কিছু বিয়েছিলেন কিনাত করে, তার সুদে চলে যায় একরকম। এখন ভাল আছি, মনুষ্য জীবনের গভীরতা এখন যেন একটু একটু করে বুঝতে চেষ্টা করে চলছি।"

কাকলি অবাক হয়ে শুনছিল, এবার মুখরা মেয়ে চুপ করে থাকতে পারলো না। বলে ফেলে, "আচ্ছা এই পরিমলবাবুই কি রাজলক্ষ্মীদির স্বামী ছিলেন? এতদিন আমি জানতাম রাজলক্ষ্মীদি বিধবা অথবা বিয়ে করেননি, কি আশ্চর্য্য।"

কেউ তার কোন কথার উত্তর দেয় না। নিরুদ্ধ চিন্তার মগ্নতায় সবাই চুপ। কখন ক্লান্ত শরীরে ঘুম নেবে আসে, নিজেরাও বোধহয় জানতে পারেন না।

এর দুদিন পর সবাই কলকাতায় ফিরে আসে। যার যার বাড়ী চলে যায়। আবার সেই রোজকার স্কুল, জীবনের গতি তরান্বিত করে দেয়। উত্তরপাড়ায় ডেলি প্যাসেঞ্জার, এরা তিনজনই একসাথে স্কুল থেকে ফেরে, যাবার সময় যার, যার সুবিধা মত যায়, স্কুলের পরীক্ষা, খাতা দেখা, তারপরও স্কুল মিটিং এই সব নিয়ে তিনজনই ব্যস্ত।

রাজলক্ষ্মী একটি পরিবারের সাথে, সাবলেটে একটি ঘর ভাড়া করে আছে, বাথরুম আলাদা, রান্নাঘরেই করে রাখে রোজ রান্না করতে পারে না, তিন, চার দিনের রান্না করে ফ্রিজে রেখে দেয়। এইভাবেই নিজের মত থাকে। চার বোনের মধ্যে এখন দুইজন আছে ওরা, মাঝে মাঝে আসে ওরা, বড়দাও আসে তবে রাজলক্ষ্মীই বেশী যায়, বৈচিত্র্যহীন জীবন চলতে থাকে। হরিদ্বার থেকে ফিরেছে প্রায় দু'মাস হল, হঠাৎ ছুটির বিকেলে ওর দরজায় বেল বাজে।

রাজলক্ষ্মী দরজা খোলে, দেখে একটি বিবাহিত অল্প বয়সী মেয়ে, ও তার সাথে সুদর্শন একটি ছেলে, দেখতে দু'জনই সুন্দর, হয়ত সদ্য বিয়ে হয়েছে ;

রাজলক্ষ্মী বলে, "আপনাদের চিনতে পারছি না, বোধহয় বাড়ী ভুল করেছেন, কাকে চান?"

মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলে, "মা আমরা, আমি রঞ্জিতা ও সৌরভ।"

সন্তানহীনতা অপমানের কুড়ুল হৃদয় উজাড় হয়ে ওঠে, দুই চোখের জল গাল বেয়ে ঝরে নামতে থাকে ; মা, মা ডাক, রঞ্জিতার। মাতৃহৃদয়। হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েকে। বুকের মধ্যে রঞ্জিতার মুখটি।

মুক্তিনাথ

অশোক ভট্টাচার্য

—নমস্তে।

—নমস্তে।

—হ্যাভ্ ইউ কাম্ফি ইউ হ্যাভ্ কাম?

—অ-স্-ট্রেলিয়া।

—ও, কাম্ফি অফ্ ডন্ ব্যাডম্যান?

—ও, ইয়েস্, ইয়েস্। বলতে বলতে হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল অষ্ট্রেলিয়ান যুবক-যুবতী।

এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ। আমরা চারজনে আগু-পিছু করে হেঁটে চলেছি। পথ কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই। সঙ্গে দল-বাহাদুর, পোর্টার-কাম্-গাইড।

মিনিট পনের-ও হাঁটা হয়নি। দেখি চড়াই বেয়ে উপরে উঠে এলো আবার কয়েকজন বিদেশী। নমস্তে বিনিময়ের পরে

—ফ্রম হুইচ্ কান্ট্রি ইউ হ্যাভ্ কাম্?

—নি-উ-জিল্যান্ড।

—আর ইউ?

—ইন্ডিয়া।

—ইন্ডিয়া?—ফ্রম কালকাট্টা?

—ও, ইয়েস্, ইয়েস্ বলে হাসি বিনিময় করে পরস্পরকে অতিক্রম করে যাই।

এ বড় বিচিত্র একপথ। সমস্ত পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেরই মানুষ হেঁটে চলেছে এই পথে। আধঘণ্টা-পনেরো মিনিট বাদেই দেখা যাচ্ছে কোন না কোন বিদেশী হয় ফিরছে, নয় যাচ্ছে।

সেই ভোর বেলাতেই শুরু, চারদিক দেখতে দেখতে হেঁটে চলা। কোন দিন বা দুপুরে এসে থেমে যাওয়া। আবার কোনদিন বা দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যেয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রামের জন্যে লাঠিটা ভর দিয়ে। মাঝাটা পাহাড়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। পাশ দিয়ে মাল নিয়ে হেঁটে যাওয়া পাহাড়ী লোক দেখলে মাঝে মাঝে হয়তো সামনের একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করছিলাম—

—'আউর কেতনা দূর ভাই?'

উত্তর দিতে—'থোড়া দূর—আধা ঘন্টা কা পথ।'

হেসে বলি, 'আপ্‌কে লিয়ে আধা ঘন্টা মেরে লিয়ে দো ঘন্টা।'

ওরাও হয়তো হেসে উত্তর দেয়, 'নেহি, নেহি, আপ্‌কা লিয়ে আধা ঘন্টা।' একটু যেন আশ্বস্ত হয়ে আবার পথ চলা শুরু করি। দীর্ঘ সে পথ। এ পথের যেন শেষ নেই। কেনই বা দীর্ঘায়িত হবে না। এ যে মুক্তির পথ। আমরা চলেছি মুক্তিতীর্থ-মুক্তিনাথ দর্শনে। নেপালী হিমালয়ে প্রায় ৩৮০০ মিটার উচ্চতায় যাঁর অবস্থান।

আজকাল তো আর যাব বললেই হট করে যাওয়া চলে না। প্রস্তুতি পর্বটা চালাতে হয় বেশ কিছুদিন আগে থেকে। রিজারভেশনের প্রথম দিনেই শেষ রাত থেকে লাইন দিয়ে রেলের টিকিট কাটা হোল;

—আর. এ. সি-ও নয়। ওয়েটিং লিষ্টের ১২৬ থেকে ১২৯-ও।

—তাই-ই সই। দেখা যাক যাওয়ার দিনে কতটা এগুনো যায়। এগুনো দূরে থাক, যাওয়ার দিন যত কাছে আসছে তত যেন নানান বার্তায় পিছিয়ে পড়ছিলাম। ভ্রমণসঙ্গী মাষ্টারের দাদা কাশ্মীরে ভুগছে। খবর এসেছে অবস্থাটা ভাল না। তাই তার অবস্থার উপর নির্ভর করছে মাষ্টারের বেড়াতে যাওয়া। বাজার দু'দিন আগে সঞ্জীব ঘোষ এসে বলল, 'অশোকবাবু আমার হয়তো আর যাওয়া হোল না। বাবা তো একে অসুস্থ। সা-ই তার বেশী দেখাশোনা করত। কিন্তু চারদিন হোল মা আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়ে আই ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আগামীকাল ছুটি দেওয়ার কথা। তার পরের দিনই রওনা দিতে পারব তো। যাওয়ার আগের দিন বিশ্বনাথ ফোন করে বলল, 'অশোক আর একবার ভেবে দেখ ই. সি. কি. করে তোর হার্টের অসুখটা যখন ধরা পড়েছে, তখন যাওয়াটা কি তোর ঠিক হবে?'

ঠিক হয়েছিল কিনা জানি না, তবে চার বন্ধুতেই এসে উপস্থিত হয়েছিলাম শিয়ালদহ ষ্টেশনে—রাত্রি ৭-১৫ মিঃ-এর দার্জিলিং মেল ধরব বলে। ১২৬-এর ওয়েটিং লিষ্ট এগিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২-এর আর. এ. সি-তে। তাই-ই যথেষ্ট।

ভোরবেলায় জানলার ধারে বসে আছি। ট্রেন ছুটে চলছিল দূরন্ত গতিতে। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার পরিচিত দৃশ্য একটার পর একটা চোখের সামনে ভেসে উঠেই দূরে সরে যাচ্ছিল। টিকিট-চেকারের কাছে শুনে জানলাম ট্রেনটা একঘণ্টা 'লেট' রান করছে। মাত্র একঘণ্টা! বর্তমান অবস্থায় তো কিছুই নয়। সোজা আটটায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছনোর কথা। না হয়, সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছবে। কিন্তু হঠাৎ দেখি ট্রেনটা থেমে গেল। থামতেই পারে, সামনে সিগন্যাল না পেলে। কিন্তু এ যে দেখি দীর্ঘ সময়েও নড়েও না চড়েও না। লোকজন নামতেও শুরু করে ইঞ্জিনের দিকে চলতে শুরু করেছে। ঔৎসুক্য বশে নেমে দেখি, কিসফ্রেট খুলে নিয়েছে, লাইনটা প্রায় এক হাত ফাঁক হয়ে গেছে। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা যদি লাল কাপড় দেখিয়ে ট্রেনটা না থামিয়ে দিত তবে হয়তো মুক্তিনাথ অদেখাই থেকে যেত।

সামরিক মেরামতী করে ট্রেন ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি যেন এক মেলা চত্বর। অসংখ্য রিক্সা, অটো, ট্যাক্সি আর জীপের মেলা। আপাতত গন্তব্যস্থল শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড। শুনে এসেছিলাম রিক্সায় পনেরো টাকা নেয়। কিন্তু হেঁকে বসছে চল্লিশ টাকা। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম শিলিগুড়ির সঙ্গে সহজে যোগাযোগকারী ব্রীজটা নাকি কয়েকদিন হোল ভেঙ্গে গেছে। তাই বহু ঘুরে তবে শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে যেতে হয়। কি আর করা যাবে। ঘুরতেই তো এসেছি। আপাতত রিক্সায় চেপেই না হয় শিলিগুড়ি শহরটা ঘুরে দেখি।

বাসস্ট্যান্ড থেকে পানিট্যাঙ্কির দূরত্ব প্রায় ৩৭ কি.মি.। বাসে লাগল ঘণ্টা দেড়েক। পানিট্যাঙ্কি থেকে মেচি নদী পেরিয়ে যেতে হবে নেপালের সীমান্ত শহর কাঁকড়ভিটা। পানিট্যাঙ্কি থেকে ঘুরন্ত বাসের উৎকের রেশটা সেদিনও কাটেনি। এক এক জায়গায় মেলা বসে লোকের জটলা দেখা যাচ্ছিল। প্রায় প্রত্যেকেরই সারা কপাল জুড়ে লাল-হলুদের কি যেন বাটা লেপে দেওয়া রয়েছে। নিঃসন্দেহে কোন এক মাসলিকের চিহ্ন।

পোখরা বাস স্ট্যান্ডে এসে বাসটা পৌঁছাল সকাল সাতটা নাগাদ। বাড়ীঘর দেখে মনে হলো বেশ জনবহুল শহর। কিন্তু তখনও জনতার ঢল পথে নামে নি। প্রায় এক ঘণ্টার যাত্রা বিরতি এখানে। তাই বসে না থেকে নেমে পড়ি। দূরে নীল আকাশের কোলে মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্গে তখন সোনালী সূর্য্যের আভা। এরই ছায়া পড়ে পোখরার কিউরা তালে। যা টুরিষ্টদের আকৃষ্ট করার এক উৎকৃষ্ট "স্পট" এছাড়া আছে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। মহেন্দ্রকেভ্ প্রভৃতি।

আমরা পোখরা দেখব ফিরে এসে দীর্ঘ পথশ্রমের পর দু-একদিন বিশ্রামও হবে, আর পোখরা দেখাও হবে। আগে বাসলুং পর্যন্ত যখন বাস ছিল না তখন পোখরা থেকেই পায়ে হেঁটে মুক্তিনাথ যেতে হোত। দূরত্ব প্রায় ১২১ কি.মি.। এখনও অনেকে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর দীর্ঘ ট্রেকিং-এর আনন্দ উপভোগ করতে—পোখরা থেকে সুইখেত, নৌডান্ডা, ডিরকেদুঙ্গার পর, উতেরী চড়াই পার হয়ে, ঝরনাঘাটি, ঘোড়েপানির পর এসে পৌঁছায় তাতোপানিতে। তবে আমাদের পথ বাসলুং হয়ে। সেক্ষেত্রে কিছুটা সংক্ষেপিত হয়ে ৯০ কি.মি.-এ দাঁড়াবে শুনেছি। বাসলুং থেকেও মাঝে মাঝে বেশী পর্যন্ত মালবাহী ট্রেকার পাওয়া যায় শুনেছি। তাই ভোরের পোখরায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বাসে এসে বসলাম।

বাস সাড়ে ন'টা নাগাদ বাসলুং-এ এসে আমার সমাপ্তি করল। ট্রেকারের খোঁজটা নিতে গিয়ে জানা গেল এর কোন সময় নেই। বেশী থেকে ট্রেকার এসে তবে যাবে, না হলে যাবে না। তবে আপাতত কারণ নেই, কয়েকটা ট্রেকার আছে। পাওয়া যাবেই।

বাসস্ট্যান্ড থেকে আর একটু হেঁটেই একটা হোটেলে এসে উঠলাম। এখানেও সেই যাওয়ার ফিনিসিং টয়লেট ব্যবস্থার ও কয়েক ঘণ্টা পড়িয়ে নেওয়া ট্রিপ।

এগারটা নাগাদ একটা ট্রেকার ঢুকতেই ভাবলাম কম, আমাদের মধ্যেই তাহলে একটা ট্রেকার পাওয়া যাবে। কিন্তু ড্রাইভার সহদেব শ্রেষ্ঠাদেন—না, আড়াইটের আগে ছাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কি করি। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ হোটেলের মালিকটি বলে উঠল, "বাবুসাব আপ কেত্তী জায়গা।"

বলি, "হ্যাঁ, বেশী যাব বলেই তো ট্রেকারের খোঁজ করছি।"

—"পয়দল মে চলা যাও।"—কয়েকজন নারী-পুরুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখিয়ে বলল, "এ আদমী কেত্তী দূর রাহা যায়। ইনকে সাথ চলা যাও। তুরন্ত পৌঁছ যায় গা।"

তাড়াহুড়ি চার বন্ধুতে চারটে ব্যাগ ঘাড়ের পরে ফেলে ওদের পিছু নিই। গ্রামের মধ্যে দিয়ে তখনও চড়াই, কখনো উৎরাই-এ পথটা বুঝতে পারলাম 'সার্কিট'। কিন্তু পাহাড়ে লোকের সাথে হাঁটতে গিয়ে আমাদের শহুরে পদযুগল যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কতবার আর ওদের থেকিয়ে রাখা যায়—'একটু আস্তে হাঁটো ভাই। তোমরা কেত্তী এগিয়ে গেলে আমরা আর পথ খুঁজে পাব না।' ওদের মহিলা আর বাচ্চারা তো হেসে খুন। জোয়ান মদ্দ লোক, মহিলার সাথেও হেঁটে পারছে না। শেষে একটা নদীর ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তার পরে পড়লে ওরা বলেই ফেলল, 'যার অর্থ দাঁড়াচ্ছ—তোমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। এখনো অনেক বেলা আছে। ট্রেকার একটা না একটা আসবেই। তাতেই তোমরা বেশী যেও।

ওরা চলে গেল। আমরা বসে রইলাম একটা দোকানঘরের বেঞ্চিতে। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে একটা ট্রেকার এলো। তার উপর আবার একপাল লোক কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে-বসে আছে। মাঝপথ থেকে আবার আমরা চারজন, মালের বোঝা নিয়ে। খানিক জোরজার করে আমাদের তুলে নিয়ে গেল বটে তবে মানুষ বলেই যাওয়া সম্ভব হলো পশু-ছাগলেরও ওইভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরী রাস্তা। ট্রেকারটা যেন সরাচ্ছা রাস্তাই লাফাতে লাফাতে এসে পৌঁছাল বেশীতে (৮২৩ মি.)। তখন প্রায় আড়াইটে। ট্রেনে-বাসে দূরন্তি কাটানোর পর যাত্রা বিরতি আজ আমাদের এখানেই।

কালীগণ্ডকী নদীর ব্রীজ পেরিয়ে মুক্তিনাথে যাওয়ার রাস্তার ধারে হোটেলগুলো। একটা ঠিক করে মালপত্র রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। পোর্টার-কাম-গাইডটা এবার ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু কি মুস্কিল। বেশীতে পোর্টার পাওয়া যায় না একটা-দুটো যা পাওয়া গেল তাদের আবার শরীর খারাপ বলে। মুক্তিনাথে এখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে—ওই ঠাণ্ডাতে জবে না। ভাবি বলে কি? ঠাণ্ডার দেশের লোক, ঠাণ্ডাতে যেতে ভয় পাচ্ছে? আমরা তবে যাব কি করে? খুঁজতে খুঁজতে অল্পবয়সী ছেলে পাওয়া গেল। পাস দলবাহাদুর। প্রতিদিন তাকে খাওয়া ছাড়া নেপালী মুদ্রায় ১২০ টাকা দিতে হবে। মনে ভাবি ভুল শুনছি না তো? বাসলুঙে পোর্টাররা চেয়েছিল ২৫০ টাকা। আর এ ১২০ টাকা। ও আসলে গাইড নয়। মুক্তিনাথ কোনদিন যায় নি। জোমসুম পর্যন্ত একবার গিয়েছিল। আমাদের সাথে মুক্তিনাথ দর্শনটা সেরে নিতে চায়। আমাদের তাতেই সই। মাল বয়ার দড়িগুলো আমাদের হোটেলে রেখে বলে গেল কাল ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক দেবে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে মুক্তিনাথের পথের ধারে প্রশস্ত একটা জমিতে গিয়ে আমরা বসলাম। সামনে কালীগণ্ডকী নদীর বয়ে চলেছে। পিছনে সুউচ্চ পাহাড়। শান্ত পরিবেশ। কেমন যেন মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম কাল থেকে সুরু হচ্ছে দীর্ঘ বন্ধুর পথে পথ চলা। মুক্তিনাথ দর্শন হবে তো।

দল-বাহাদুর ঠিক সময়েই চলে এসেছিল। আমরাও প্রায় তৈরী হয়েছিলাম। একটু পরেই মুক্তিনাথের নাম স্মরণ করে যাত্রা সুরু করলাম। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ছোট একটা ব্যাগে টুকিটাকি জিনিষ নেওয়া। দল-বাহাদুর আমাদের চারজনের চারটে ব্যাগ পিঠের

পরে বেঁধে নিয়ে চলতে সুরু করল আমাদের সাথে। কারও মুখেই কোন কথা নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে পর্বতশৃঙ্গে সবেমাত্র সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে। শুধু কালীগন্ডকীর জলস্রোত শব্দ করে বয়ে চলেছে উপর থেকে নীচে। আর আমরা তারই পাড় বেয়ে চলেছি নীচে থেকে উপরে। যেন তার উৎস সন্ধানে।

কালীগণ্ডকী নেপালীদেরে কাছে এক পবিত্র নদী। এর উৎস মুক্তিনাথ থেকে আরও তিন-চার দিনের পথ পেরিয়ে তিব্বতের দুর্গম ৪৭ হাজার ফুটে। নেপালের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ভারতের গোরখপুরের কাছে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। ভৌগোলিক উৎস যা-ই থাক, পবিত্রতার সাথে পৌরাণিক কোন উৎস থাকবে না ; তা হয় কখনো!--কালীগণ্ডকীর উৎস নিরূপণে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন গল্পের বলা আছে। তার একটা যেমন, জগতের মঙ্গল কামনায় ভগবান বিষ্ণু একবার হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। এক সময় তার ভিতরে তাপের সৃষ্টি হওয়ায় কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘাম গণ্ড বেয়ে নদীরূপে নেমে আসে। তাই এই নদী হলো পবিত্র, নাম হয় গণ্ডকী।

কালীগণ্ডকীর পৌরাণিক কথা ভাবতে ভাবতে আমরা ততক্ষণে অনেকটা পথ চলে এসেছি। পেরিয়ে গেছি বৈশারীগ্রাম, বেণ্ডখোলা, টিপলিং। পাহাড়ী পথে কিছু কিছু কসতি নিয়ে গড়ে ওঠা প্রাচীন গ্রাম। সবটাই যে চড়াই বা উৎরাই তা নয়। আছে বিস্তৃত সমভূমিতে সবুজ বনানীর মধ্যে দিয়ে চলা। চলার পথে সহজ সরল পাহাড়ী মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার দৃশ্যাবলী চোখের পরে ভেসে উঠছিল। এক এক করে দেখা দিল দুধারাবৃত্ত সুউচ্চ নীলগিরি, ধৌলগিরি।--এসে গেল গ্রাম মহাজীর। তারপর রাতোপানি। সুপ্রসিদ্ধ তাতোপানি নয়। এটা রাতোপানি। এখানেও লোকালয় থেকে একটু নীচে তাতো অর্থাৎ তপ্ত জলের কুণ্ড আছে। রাতোপানির পরে তাতোপানি (১১৮১ মি.)।

এই তাতোপানিতেই আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা বিরতি। কে হোটেলটাতে ওঠা হোল তার উল্টোদিকে সামনেই দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে 'Way to Hot Springs' হটস্প্রিং, কিন্তু গিয়েই ইজাজত নামা জমা দিতে হবে। আগে নেপালী মুদ্রায় পাঁচ টাকা দিতে হবে। তারপর হটস্প্রিং থেকে বয়ে যাওয়া পাঁচ-ছটা নল আছে--সেখানে হাতে পায়ের ময়লা, এমনকি শরীরের ময়লাও ওখানে আগে ধুয়ে নিয়ে তবে গরম কুণ্ডে নামতে হবে। অগভীর পাশা পাশি দুটো কুণ্ড। সারাদিন হাঁটার পর অনভ্যাসে শরীরটা যেন প্রথম দিনেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ গরম কুণ্ডে শরীরটা চুবিয়ে রাখার পরে মনে হোল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় দিনে যাত্রার সুরু হোল প্রায় সাড়ে ছয়টায়। বিভিন্ন নীলগিরি পর্বতের শিখরচূড়া। সদ্য বরফের উপর সোনালী রোদের আভা ছড়িয়ে। প্রায় ৫/৬ কি.মি/ চলার পর এলো দানা (১৪৯০ মি.)। কমলালেবু বাগান সমৃদ্ধ একটা কসতি যুক্ত গ্রাম। আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল এক জলপ্রপাত। সুন্দর। নামও রূপসী ঝোলা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। আর মনে মনে ভাবি এর পরেই তো কোপচেপানি। তারপরেই সুরু হবে দেওরালির কষ্টকর চড়াই। পোখরার পরিবর্তে বাগদুং থেকে যাত্রা সুরু করলে উলেরী চড়াইকে এড়ানো যায়। কিন্তু দেওরালির চড়াইকে সবারই উৎরাতে হবে। দেওরালির পরে পাইরোথাপলা। তারপরে খাসা (২০১০ মি.)। এখানেই আমাদের দ্বিতীয় দিনের যাত্রা বিরতি। এ পথের সুবিধে এই যে ২-৩ কি.মি. পরে পরেই একটা গ্রাম পাওয়া যায়। আর সেখানে থাকার ব্যবস্থা ভাল না হলেও খাওয়া-থাকার সুবিধে আছে, তাই চলতে চলতে কোথাও যদি পরিশ্রান্ত বোধ হয় বা কোন জায়গা ভালো লেগে যায় তবে থেকে যাওয়ার অসুবিধে নেই। মালা থেকেই নেপালী ভেটিয়ানদের বাস বাস সুরু।

তৃতীয় দিনের যাত্রা হোল খাসা থেকে। সবটাই যে চড়াই তা নয়। মাঝে মাঝে নদীর চড়ার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় তাই তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে 'Winter Way' এবং 'Summer Way'। শীতের সময় নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যায়। তাই সুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু নিশ্চয়তাও নেই। যাওয়ার সময় দেখে গেলাম বরফ চুঁয়ে স্বচ্ছ জল শীর্ণ ধারায় বয়ে যাচ্ছে। ফেরার সময় দেখা গেল ঘোলা জল, স্রোতও বেশী। মাঝে মাঝেই জুতো খুলে হাঁটু পর্যন্ত ঠাণ্ডা জল পার হয়ে যেতে হচ্ছে। দল-বাহাদুরের কারণ কি জিজ্ঞেস করায় বলল, পাহাড়ের উপরের দিকে বোধহয় খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তাই হঠাৎ জল বেশী হয়েছে। আর মাটি ধুয়ে আসার ফলে ঘোলা হয়ে গিয়েছে। খাসার পরে এসে গেল কাইকুগ্রাম। তারপর লেতে (২৪৩৮ মি.)। লেতে গ্রাম এক অপূর্ব জায়গা। চারপাশে সুউচ্চ পর্বত দিয়ে ঘেরা। সাদা বরফের শৃঙ্গগুলোর উপরে পূর্ণিমার চাঁদের আলো যখন পড়ে তখন মনে হয় যেন রুপো ঢেলে দিয়েছে সারা পর্বত জুড়ে। বন্ধুরা তাই পরামর্শ দিয়েছিল এক রাত যেন লে-তে কাটিয়ে যাই। কিন্তু লে-তে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুরও হয়নি। তখনই যাত্রা বিরতিতে কেউ রাজী হোল না। তাই ফেরার সময় লে-তে এক রাত পর এলো ফোপানি (২ ৫ ৩ ০ মি.)। পথ চলতে চলতে দৃষ্টির সামনে কখনো বা এসে পড়ছে নীলগিরি, কখনো বা ধবলগিরি। আবার কখনও বা অন্নপূর্ণা তার এক নম্বর, দুই নম্বর বা তিন নম্বর শৃঙ্গ নিয়ে। কয়েকখানি গ্রাম অতিক্রম করে যাওয়ার সময় দেখি রাস্তার পাশে কি যেন পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করতেই দেখি এ যে মানুষ! অতি বৃদ্ধা এক মহিলা বসে আছেন। বার্ধক্যের ভারে মুখ-হাতের চামড়াগুলো বিভৎসভাবে কুঁচকিয়ে রয়েছে। চোখের পাতা নেমে এসে চোখ দুটো প্রায় বোজা। মাথায় এক বোঝা সাদা পরচুলোর মত চুল। মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম--বাকুমা, তোমার বয়স কত? ভাষা বোঝার কথা নয়--কিন্তু ভাবে কিছু বুঝতে পারল কিনা জানি না। এক গাল সরল হাসি হেসে ডান হাতের চেটোটা তুলে ধরল।

ফাকেথাঙ্কির পরে 'থার্ক'। তারপরে এলো লারজুং (২৫৪০ মি.) তৃতীয় দিনের যাত্রা বিরতি ওখানেই। ওখানেই অধিকাংশ হোটেল মানেই নিজেদের বাসগৃহ-কাম-হোটেল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখতে পেলাম পাকা ভুট্টা একেবারে গোলাভর্তি। কেউ কেউ আবার বাড়ীর সিলিং-এ সারি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। যেন সিলিংটা একটা আলাদা রূপ ধারণ করেছে। লারজুং থেকে সুরু হয়েছে আপেলের বাগান--একেবারে সার্থ পর্যন্ত। তার সাথে সুন্দর পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। হোটেল ঠিক করার পরে প্রায় সন্ধ্যে রাতেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝ রাতের পরে বিশ্বনাথ সবাইকে ডেকে তুলে বাইরে এনে হাজির করল। দেখি বাইরে এক অপরূপ দৃশ্য। শেষ

রাতের চাঁদের আলোর চারদিক ভেসে গেছে। আকাশে অসংখ্য তারা গায়ে গায়ে যেন লেগে গিয়ে মাথার কাছে নেমে এসেছে। সামনে সুউচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট এক পর্বত। সন্ধ্যে রাতের অন্ধকারে যাকে লক্ষ্য করা যায় নি, শেষ রাতের চাঁদের আলোয় তার প্রশস্ত বরফ গায়ে যেন রুপো ঢেলে পুথিয়ে দিল। লারজুং আরও নিরেছিল।

চতুর্থ দিনের ভোরে যখন যাত্রা আরম্ভ করি, দেখি সুউচ্চ সেই বরফে ঢাকা পর্বত শৃঙ্গের একদিকে টান রয়েছে। অন্যদিকে প্রভাত সূর্যের আলোকরশ্মি সোনা ঢেলে দিয়েছে। লারজুং-এর পরে এলো কাবুং। কাবুং-এর পরে থুরুচে (২৫৮৬ মি.)। রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য আপেলের বাগান। আপেলের ফলন সব থেকে বেশী থোরঙের সর্বত্র। লোক বসতি এখানে বেশী। দুধারে সারি সারি দু-তিন তলা বাড়ী। রাস্তা সরু, বাঁধানো। মাঝে মাঝে রাস্তার পরে তোরণ। তাতে বুদ্ধের ছবি ও বাণী। সারি সারি পিতলের বৌদ্ধ ধর্মচক্র। বড় বড় গাছপালা। এখান কমে এসেছে। সবুজের প্রাচুর্যের পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে ধূসরতা। বাড়ছে হাওয়ার দাপট। সন্ধ্যার পরে সিরানগ্রাম পার হয়ে এসে পড়লাম জোমসুম (২৭১০ মি.)।

জোমসুম এ অঞ্চলের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। দুই দিকে দাঁড়িয়ে আছে ধৌলাগিরি আর নীলগিরি। Royal Nepal Airlines-এর এরোড্রম এই জোমসুম—এই রয়েছে। যারা একটু আয়াসে মুক্তিনাথ দর্শন করতে চান তারা পোখরা থেকে জোমসুম পর্যন্ত বিমানে আসতে পারেন। জোমসুম থেকে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় করে মুক্তিনাথ যাওয়া যাবে। জোমসুমে আছে সেনাবাহিনীর ছাউনি, পর্বটন অফিস, ব্যাঙ্ক। তাছাড়া জমজমাট দোকান-বাজার। ভাল হোটেল-এর প্রাচুর্য থাকায়, যাতায়াতের পথে বহু বিদেশী এখানে দু-একদিন থেকে যায়। পুরনো জোমসুম গ্রামটা অবশ্য নদীর ওপারে। ঘন বসতিপূর্ণ।

জোমসুম পৌঁছিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া হোল। জোমসুম থেকে রাশীপোয়া মুক্তিনাথ ১৮ কি.মি.। মুক্তিনাথের মন্দির সেখান থেকে আবার বেশ খানিকটা দূরে। তাই জোমসুমে যাত্রা বিরতি না করে ঠিক হোল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একলাভিট্টাতে রাত কাটানো হবে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে তাই যাত্রা শুরু হোল। জোমসুম গ্রামটা পেরিয়ে রাস্তা নেমে গেছে কিছুটা নীচের দিকে—কালীগণ্ডকী নদীর চড়ার উপর দিয়ে। সুদূর বিস্তীর্ণ এই চর। কিন্তু শীর্ণ, অপভীর, খরস্রোতা নদীর ধারা। শুরু হয়ে গেছে সেই বিখ্যাত কড়ো হাওয়া। যেন বিরাম নেই। গরম-জামাকাপড় যত ছিল সবই নুড়ি দিয়ে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে নদীর চর থেকে দু-একটা সুন্দর দেখে পাথর কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। এখানেই নাকি নদীর চরে নারায়ণশিলা পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে দু-এক জায়গায় দেখছিলাম লোকে বসে রয়েছে নানারকম পাথর, মালা আর নারায়ণশিলা বেচার জন্য। শিলার ভেতরে দাগ দেখিয়ে চিনিয়ে দিচ্ছিল আসল আর নকল শিলার পার্থক্য কি। কালীগণ্ডকী নদীর চরাতে নারায়ণশিলার প্রাপ্তিতেও এক পৌরাণিক উপাখ্যান জড়িত। দেবী গণ্ডকী একবার কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ বর দিতে চাইলেন। নদীর কামনা নারায়ণকে তিনি সন্তানরূপে চান। নারায়ণ বললেন, 'তথাস্তু।' তবে তিনি শালগ্রাম শিলা রূপে নদী গর্ভে থাকবেন তার সন্তানরূপে। সেই কারণেও গণ্ডকী নদীর জল পবিত্র বলে গণ্য।

চলতে চলতে এক সময় সন্ধ্যে হয়ে গেল। লোকজনের চলাচলও অনেকটা কমে এসেছে। কিশানাথের গায়ে আঘাত লাগায় প্রায়ই পিছিয়ে পড়ছিল। তাকে সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে গিয়ে এক সময় আমরা দুজন দল থেকে হয়ে গেলাম বিচ্ছিন্ন। কিছুটা পথ চলে একটা জলের স্রোতের কাছে এসে দেখি রাস্তা দুদিকে বেঁকে গেছে। কোন্ দিকে যাব বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। হাড় কাঁপানো ঝড়ের মত ঠাণ্ডা বাতাস। চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বহুদূর দৃষ্টি যায় লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। কি করা যায় দুজনে দাঁড়িয়ে ভাবছি। হঠাৎ দেখি দূর থেকে কে যেন হেঁটে আসছে। একজন বয়স্ক বিদেশী একলাই চলেছেন একলাভিট্টা থেকে জোমসুম। অসীম সাহস। কিন্তু আমরা পথের নিশানা পেয়ে গেলাম। খানিকক্ষণ হেঁটে দেখি আমাদের তিনজন অপেক্ষা করছে রাস্তার পরে বসে। একলাভিট্টা আর সামান্যই দূরে। চতুর্থ দিনের যাত্রা বিরতি এখানেই।

একলাভিট্টা থেকে দুইদিকে পথ চলে গিয়ে একটা জায়গায় এসে মিশেছে। একটা পথ কাগবেণী হয়ে অন্য পথ একবেণী হয়ে। কাগবেণী পথে প্রথম দিকে নদীপথে কিছুটা সমতল পথ হলেও পরে খুব খাঁড়া চড়াই পেরুতে হয়। আর একবেণী পথ প্রথম থেকেই চড়াই তবে তা সইয়ে নিয়ে। কষ্ট হলেও ততটা নয়। তাই যাওয়ার সময় একবেণী হয়ে, ফেরার পথে কাগবেণী হয়ে ফিরলে কাগবেণী গ্রামটাও দেখা হয়ে যায়। প্রাচীন একজনপদ কাগবেণী (৯২৩০ ফুট)। গ্রামের ঘরবাড়ীও বেশ কাছাকাছি। লোক বসতিও ঘন। ইয়াকের সাথে এর সাদৃশ্য অনেকে দেখে থাকেন। একবেণীর পথ ধরে আমরা চলা শুরু করলাম। প্রথমে এলো সিমা। তারপরে কাড়কোট (৩৫০০ মি.)।

কাড়কোটের পর রাশীপোয়া। রাশীপোয়া এই পথের শেষ বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু ঘরবাড়ী। একটা স্কুল আছে। পুলিশ ঘাঁটী। বিদেশীদের জন্যে চেক পোষ্ট। বেশ কিছু হোটেল আছে। মুক্তিনাথ (৩৭৪৯ মি.) এখান থেকে আরও প্রায় দুই কি.মি. দূরে এক পাহাড়ের পরে। এ পাহাড় বৃক্ষহীন রুক্ষ। অসংখ্য বিশালকায় ঘিরে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ডান দিকে একটু দূরে পাওয়া যাবে অতি প্রাচীন ভওরা দেবীর মন্দির। একটা বড় গুহার ভেতরে পাথর দিয়ে ঘর বানানো। নীচে জলধারার জ্বলছে নীলাভ অগ্নিশিখা। হয়তো কোন প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থান হেতু। তবু প্রাথমিকভাবে অবাক হতে হয়—জলের উপর নিরবিচ্ছিন্ন আগুনের শিখা। বাঁদিকে অল্প দূরেই শিবমন্দির। শিব মন্দির আর মুক্তিনাথের মন্দিরের মাঝ দিকে একটু উপরে উঠে গেলে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। পাহাড়ের গায়ে কিছুটা সুড়ঙ্গ পথে হেঁটে গিয়ে বৃহৎ আকারের বুদ্ধমূর্তি দেখা যাবে। আর মুক্তিনাথের মন্দির সোজাসুজি উঠে গেলে সামনে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ৩৭৪৯ মি. উচ্চতায়। মন্দিরের পিছনে ১০৮টি ধারায় জল নেমে আসছে। সামনে বাঁধানো কুণ্ড। মন্দিরটি অনেকটা প্যাগোডার মত। তিনটি স্তর। মন্দিরের গর্ভগৃহ খুবই ছোট। মধ্যস্থানে পদ্মাসনে স্থাপিত চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ। উপরের দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র, নিচের দুই হাতে অভয়মুদ্রা। পীত-বস্ত্র, মাথায় মুকুট। মাথার পরে সপ্তফণা বিস্তার করে শেষনাগ। বিগ্রহের ঠোঁট সামান্য খোলা। মুখমণ্ডলে প্রসন্ন হাসি। দুই পাশে দণ্ডায়মান দুই দেবী মূর্তি। সামনে গড়ুর।

পড়ন্ত রোদের শেষ আলোতে, পাণ্ডার বিনা উপদ্রবে, জনতার কোলাহল অতিক্রমে, শান্ত, সুন্দর পরিবেশে মুক্তিনাথের বেদীমূলে মাথা ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটু বেশীক্ষণ বেশী সময় নিয়ে

ফেলেছিলাম। বিশ্বনাথ বলে উঠল, 'আমি ভাবলাম, তুই-ও বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেলি।'

—যাব না', এত বেশী পথ হেঁটে কোন ঊর্ধ্বে তো এখনও পর্যন্ত আসা হয় নি।' সত্যি দীর্ঘ এই পথ। কিন্তু প্রকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নেপালের এই পথ কোনক্রমেই পথিককে ভারাক্রান্ত করে না। তাই তো পথ চলতে দেখা হোল সারা বিশ্বের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সাথে—খালি নমস্তে আর নমস্তে।

মুক্তিনাথের পূজারীরা পাল্পেই থাকে। দোতলা তাদের বাড়ী। আলাপ করে জানা গেল কোরাকলীর মত শীতের সময়ে তারা নীচে নেমে যান না। এখানেই থাকেন। ঐ তিন মাস ঘর থেকে বেরিয়ে ৩-৪ পুট বরফ কেটে কোন রকমে মন্দিরে দেবতার পূজো সেরে আবার ঘরে ফিরে আসেন। ঐ তিন মাসের খাদ্য তারা ঘরের মধ্যে মজুত করে রাখেন।

পরের দিন থেকে ফেরার পালা। ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়ি। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথ দিয়েই আমরা ফিরে যাব। তবে ফিরে যাওয়ার পথে উলেরি চড়াইটা উৎরাই হয়ে যাবে বলে, তাতোপানি থেকে একটু ঘুরে ঘোড়েপানি-উলেরি-বীরথাটে-লেতাওা হয়ে পোখরা গেলে, সে পথের সৌন্দর্যটাও উপলব্ধি করা যায়। আবার হাতে একদিন সময় থাকলে পোখরা থেকে বাসে ভৈরোয়ার যাওয়ার পথে ভেলিওয়াল বাস ষ্টপেজে নেমে ওখান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী দর্শন করা যেতে পারে। সেখান থেকে গোরক্ষপুর হয়ে হাওড়া ফেরা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম। কিছুদূর হাঁটার পরে সমীর ঘোষ বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলে হয় না। বাবা তো একে অসুস্থ, তার উপর মাথে সবে আই. ডি. হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে আনার পর দিনই আমি বেরিয়ে পড়েছি।' মাষ্টার বলে উঠল, 'আমারও প্রায় একই অবস্থা, ক্যান্সার দাদার খারাপ অবস্থা দেখেও বেরিয়ে পড়েছি। ফিরে যদি দেখি নেই, তবে একটা কথা থেকে যাবে। বিশ্বনাথ বলল, 'দুর্গাপুজোর পরে একেবারে একাদশীর দিনই বেরিয়ে পড়েছি—বাড়ীতে দুর্গাপুজো হয়—প্রচুর লোকজন সেদিনও ছিল—খাটাখাটুনি, ঝামেলা যা কিছু সব বৌ-এর ঘাড়ে চাপিয়ে চলে এসেছি—রেগে বোধহয় টং হয়ে আছে।

তাই স্বভাবতাই ফেরার পথে উৎরাই পেয়ে চলার গতিটা কিছুটা দ্রুত হয়ে গেল। রাণীপোয়া থেকে এসে গেল জাড়কোট। জাড়কোট থেকে একদাড়িট্রা যাওয়ার পথে আমরা ধরলাম কাগবেণীর পথ। এখন তো উৎরাই। তাই দেখেই যাই। কিন্তু উৎরাইতেই যা অবস্থা, ভাগ্যিস চড়াইতে এপথে আসিনি। জোমসুমে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছে ভাবলাম, একবার পোখরাগামী ট্রেনের টিকিটের খোঁজটা নিলে হয়। টিকিটের মূল্য বিস্তরে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের টিকিট পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রথম স্তরের টিকিটের দাম নেপালীমুদ্রায় ১৫০০ টাকা। তার জন্যে নজরানা দিতে হবে আরও ১৫০০ টাকা। আর অপেক্ষা করতে হবে তিনদিন। তাই মনে কোন দ্বিধা না রেখে দুপুরের খাওয়াটা জোমসুমে সেরে নিয়ে শুরু করে দিলাম হাঁটা। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছালাম এসে সার্থার। ফেরার পথে প্রথম আমাদের যাত্রা স্থগিত।

সার্থা থেকে রওনা দিলাম ভোরেই। হেঁটে চলেছি। কে জানে আজ কোথায় গিয়ে থামতে হবে। এ-কয়দিন আবহাওয়া কেশ ভালই ছিল। কিন্তু আজ মেঘলা। সূর্যের কোন দেখা নেই। ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে শীত বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। ফেলে চলেছি টুকুচে, কাবুং, লারজুং। লে-তে এসে যখন পৌঁছালাম তখন সবে আড়াটা। কিন্তু আকাশে ঘন মেঘ, টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে হাড় যেন কাঁপিয়ে আসছিল। অতি বড় দুঃসাহসীও আজ বেরুতে সাহস করবে না। তাড়াতাড়ি একটা হোটেল—অর্থাৎ বাসগৃহ-কাম-হোটেলে ঢুকে পড়তেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আসলে লে-তে এক রাত থাকা আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল। যাওয়ার সময় থামি নি। ফেরার সময়ও কঁকি দিয়ে চলে যেতাম। তাই আবহাওয়া এসে বাধ সাধল। মনে মনে ভাবছিলাম যদিও বা থাকা হোল, রাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর দেখা হবে না। কিন্তু না দু-তিন ঘণ্টা বৃষ্টির পরে মেঘমুক্ত নক্ষত্রখচিত পরিষ্কার আকাশ ফুটে উঠল। খানিকবাদে চাঁদের আলো চার পাশের পর্বত শিখরে ছড়িয়ে পড়ে এক অপার্থিব মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করল। যা হাদয় দিয়ে উপলব্ধি করা গেলেও ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা দুষ্কর।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে দেখি পরিবেশন করছে জিন্সের প্যান্ট পরা এক অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়ে। বেশ হাসিখুসি। গড় গড় করে ইংরাজী বলে আমাদের অনেক কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম কি ব্যাপার! এ কয়দিন কাজ চালানোর মত দু-একটা ইংরাজী শুনছিলাম বটে, কিন্তু এতো তা নয়। এ জাপানের এক ধনী শিল্পপতির পুত্রবধূ। বছর খানেক আগে শিল্পপতির পুত্র এসেছিল নেপালে। মুক্তিনাথের ট্রেকিং উপভোগ করতে গিয়ে একরাত লে-তে এদের বাড়ীতে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। প্রেমের পরিণতি পরিণয়ে। উড়ে যায় জাপানে। সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে এখন এসেছে বাপের বাড়ীতে। স্বামী যুবকটি তিন-চার মাসের জন্যে বাড়ী থাকবে না। বিজনেস টুরে যাবে ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড। তাই টোকিও থেকে কাঠমাণ্ডুগামী বিমানে তুলে দিয়ে তাকে বলে দিয়েছে—ফেরার পথে তিন-চার মাস নিয়ে আসবে। তিন মাস হয়ে গেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার স্বামী এসে পড়বে বলে তার বিশ্বাস। সুন্দর, সরল কচি মুখখানিতে এতটুকু নেই সন্দেহের অবকাশ। কিন্তু আমাদের চার জোড়া পাথরে চোখের পরে দেখা দিল আশঙ্কার ছায়া। মনে মনে প্রার্থনা করলাম—ভগবান আমাদের আশঙ্কা যেন মিথ্যেই হয়।

লে-তের পরে, পরের দিন এসে যাত্রা বিরতি দিলাম তাতোপানিতে। আসার দিন বেণী থেকে এসেছিলাম তাতোপানি। তাই ফেরার দিন তাতোপানি থেকে দুপুরের মধ্যেই বেণী পৌঁছাতে চাই। যদি ট্রেকার পাওয়া যায়. সন্ধ্যের মধ্যে বাগলুং। সেখান থেকে বাস ধরে রাতে পোখরা।

প্রায় তিনটে নাগাদ আমরা বেণী পৌঁছিয়ে পার হয়ে গেলাম কালীগণ্ডকী নদী। বাজারের কাছাকাছি আসতেই দল-বাহাদুর বলল, 'বাবু তুরন্ত আনা, এক ট্রেকার দেখা যা রাহা হ্যায়'—ট্রেকার রেডি। একটা 'মিস' হলে পরেরটা কখন ঠিক নেই। প্রায় ছুটেই এসে গেলাম ট্রেকারের কাছে। লোক ভর্তি হয়ে গেছে। এখনই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি দল-বাহাদুরের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম ট্রেকারে। ট্রেকার ছাড়ি দিল। নীচে দাঁড়িয়ে দল-বাহাদুর হাত নাড়ছে। চলন্ত ট্রেকার থেকে আমরা চারজনে হাত নেড়ে চলেছি। দূরত্ব বাড়ছে। বিদায় দল-বাহাদুর বিদায়। বিদায় বন্ধনমুক্ত, অমলিন পার্বত্য প্রকৃতি। আমরা ফিরে ফিরে প্রবেশ করলাম চিরপরিচিত যান্ত্রিক সভ্যতার নাগপাশে।

বিকল্প সংস্কৃতির অন্য ধারা

সুব্রত কাঞ্জিলাল

ছোট গল্পকে বলা হয় শিল্প বিপ্লবের ফসল। সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অনুসঙ্গে ছোট গল্প অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আধুনিক শিল্প রসোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটকের জন্ম ও প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। দেশে দেশে সাম্যবাদী আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ভূমিকায় একাঙ্ক নাটক হয়ে ওঠে অন্যতম সাংস্কৃতিক আয়ুধ।

চল্লিশের দশকে মহান গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম অবদান হল থিয়েটারকে ব্যাপকতম জনতার মুখোমুখি সম্মুখে মুক্তি দেওয়া, বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যের জন্ম বৃত্তান্তের খোঁজ নিলে জানা যায়, নাটকের জন্ম হয়েছিল কৃষিকার্যের অঙ্গরূপে। কৃষকরাই ছিলেন প্রাথমিক নাট্যকার। নাটকের পরিণতির পশ্চাতেও ছিল তাঁদের উৎসাহ ও আনন্দ, তাঁদেরই অনুভূতি ও উত্তেজনা। (The impetus of the growth of drama come form the development of agriculture...—Marxism and Poetry by George Thomson. P—38)

পরের ইতিহাস শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ইতিহাস। অর্থাৎ কৃষকদের উৎপন্ন সম্পদের বিনে শাসকশ্রেণীর ধাবা বসানোর প্রক্রিয়ায় কৃষকদের সৃষ্ট সুকুমার সংস্কৃতিগুলোও শাসকশ্রেণীর ভাণ্ডারে উঠলো। যে শিল্প সংস্কৃতি জনসাধারণের হাতে স্বাভাবিক এবং সুস্থভাবে পরিণতি লাভ করতে পারতো, তা পরিণত হোল শাসকশ্রেণীর প্রচার বিভাগে, জনসাধারণের শাসন ও শোষণের অস্ত্ররূপে। নাট্য সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ চার্লস উইলিয়াম ওয়াল্লেস ইংল্যান্ডের নাট্য-সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, "Naturally, the drama should have developed fust among the people ; practically it could not; and historically it did not." (The Evolution of English Drama upto Shakespeare, by Charles William Wallace Ph. D. P-118.)

রাজদরবারের উঠান থেকে থিয়েটারের মুক্তির পক্রিয়া শুরু হয়েছিল গিরিশ ঘোষদের যুগে। "নীল দর্পণ" নাটক নিয়ে গণতান্ত্রিকরণের উদ্যোগ, অর্থাৎ টিকিট কেটে থিয়েটার দেখার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গণনাট্য দেখিয়ে দিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে থিয়েটারের অপরিসীম গুরুত্ব, সাম্যবাদী রাজনীতি প্রচারে থিয়েটারের ভূমিকা ঐতিহাসিক। বিশেষত ছোট ছোট দলের ছোট ছোট নাটকের ভূমিকা অসামান্য। চীনের বিপ্লবে পেরিলা স্কোয়াডের মত ছোটা নাটকের দল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যেত। সত্তরের দশকে পশ্চিমবাংলার একাঙ্ক নাটক বা ছোট নাটকের প্রায় তিন হাজারের মত দল তাদের প্রতিযোগিতা মঞ্চকে শ্বেত সন্ত্রাসবাদ, আধা ফ্যাশিস্ত শাসক শ্রেণীর বাবতীয় অপশোষণ বিরোধী লড়াই-এর মঞ্চে পরিণত করেছিল। শত শত নাট্য-কর্মী সে সময় পুলিশ ও ফ্যাশিস্ত গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নির্যাতন সহ্য করেছে। খুন হয়েছেন। কলা বাহুল্য কলকাতার এলিট থিয়েটারের তথাকথিত বাম মার্গী বুদ্ধির স্বেচ্ছিবিলাসদের গায়ে সে সময় সামান্য আঁচটুকু লাগেনি। তুলনামূলকভাবে তারা নিরাপদ দূরত্বে বসে প্রগতিশীল সংস্কৃতির বাহ, উদগার করেছেন। আজ পরিবর্তিত সময়ে বামপন্থী সরকারের কাছ থেকে ক্ষীর ননী দুধের পুরু সর নেরে দেওয়ায় তারাই প্রধান অধিকারী।

এই লেখায় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমি বলতে বসেছি কলকাতা ও মফস্বল শহরে ছড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক নাট্য-কর্মীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা। কলকাতার এলিট থিয়েটারের বাইরে আদর্শবাদী থিয়েটারের সৈনিকদের প্রতি উদাসীনতার কথা।

একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত ৫০ বছরে প্রায় ৩৭০০০ দলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গণনাট্যর শাখা সংগঠনগুলো সহ ছোট নাটকের চর্চা কেন্দ্রীক থিয়েটারগুলো ধরা হচ্ছে।

সংখ্যা প্রতি বছর বা দশকে একই রকম থাকে না। যেমন নকাই-এর দশকে এ পর্যন্ত ১৭০০-র মত দলের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক নাটকের সন্ধান মিলছে, যার মধ্যে ৫% শতাংশও মুদ্রণ মুক্তি পায়নি। অর্থাৎ স্থায়ী ডকুমেন্টেশন নেই। নাট্য-কর্মীর সংখ্যাও বিস্ফোরক। ৩,৭০,০০০-এর বেশী। বর্তমান বাৎসরিক আয়-ব্যয়, নাট্যোৎসব প্রতিযোগিতা মঞ্চের আয়-ব্যয় মিলিয়ে প্রতি বছর ৫ কোটি টাকারও বেশী টার্নওভার হয়। এখানে কোন বড় স্পনসর্ড আর্থিক সাহায্য করে না। এই টাকাটা মূলত একাঙ্ক নাটকের দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। উল্লেখ করতে হবে এই দলগুলোর শিল্পকর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও দর্শক প্রধানত মফস্বল শহর ও দূর জেলার সাধারণ মানুষ। সংখ্যাটা প্রায় এক কোটি। কলকাতার এলিট থিয়েটারের বন্ধুরা যা কল্পনাও করতে পারেন না।

শিল্পের রসোত্তীর্ণ বিচারে একাঙ্ক নাটকের প্রযোজনার নাম পাস মার্কস পেতে পারে। নভেন্দু সেন, শ্যামল সেন, নৃপাল মুখার্জী, সমীরণ ভট্টাচার্য, জ্যোছনানয় ঘোষ,

রতন ঘোষ, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজয় ভট্টাচার্য, গোপাল দাস, সৌমেন্দু ঘোষ, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, অমল রায়, শান্তনু মজুমদার, বারারমণ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকাররা জীবনের অধিকাংশ সময় এই মঞ্চের জন্য ব্যয় করেছেন। এঁরা অর্থ চাননি, প্রচার, প্রতিষ্ঠার ইঁদুর দৌড়ে নাম লেখাননি। বিকল্প সংস্কৃতির রূপরেখা সৃজনে, সমাজ বিপ্লবের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে কমিটেড ছিলেন। এদের রচিত বহু নাটক প্রথম শ্রেণীর, গৌতম মুখোপাধ্যায়, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত বিমান ভট্টাচার্য, মুরারী মুখোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়, রুপু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শতাধিক অভিনেতৃকুলের পরিচয় পাই যারা সামাজিক সম্পদ। কলকাতার উন্মাসিক নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সমালোচকদের নিষ্ঠাচার প্রমাণ করা বলতে পারি কে বলে আমাদের নাট্যকার নেই? বাংলা থিয়েটার ভালো নাটক ও শক্তিমান অভিনেতার আকালে পড়েছেই মিথ্যা। মিথ্যা। গত ৫০ বছর ধরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বৃহৎ সংবাদপত্র ও মিডিয়ার দালালদের সৌজন্যে মিথ্যা প্রচারের ইতিহাস তৈরী করে গেছে। কবিতার মত থিয়েটারকেও এরা জীবন থেকে বিযুক্ত করে ছেড়েছে। এরা ভুলতে এবং ভুলিয়ে দিতে চায় যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি চেতনার বহিঃপ্রকাশ প্রকরণের ফলেই নাটকের জন্ম। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক বন্ধনমুক্তির আন্দোলনের ফলেই শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্ম হয়। মুক্তির আন্দোলনে বাধার সঙ্গে মানুষের যে সংগ্রাম, তাই নাটকের বিষয়বস্তু। (Drama was at every point based on the new liberating movement. It expressed that movement's sense of triumphantly overcoming obstacles, and its anguist of accumulating discords.—A short History of Culture by Jack Lindsay. P—160)

গণনাট্য থেকে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে থিয়েটারকে নিয়ে আসা হল সঙ্কীর্ণ খণ্ডিত মধ্যবিত্ত জীবনের ঘেরাটোপে। তাই তো গর্ডন ক্রেগ বলেন, "আজকের নাট্যশালায় কোনো শিল্পী নেই।"

থিয়েটার মধ্যবিত্তের তিন সুতোর জীবনের তথাকথিত বাস্তববাদী থিয়েটার সম্পর্কে আউগুস্তো বোয়াল বলছেন, "মানুষকে দেখান চলছে অথচ তাকে সেই চোখে দেখতে যে চোখে শাসকশ্রেণীগুলো জগতকে দেখাতে চায়।"

জনতার থিয়েটারকে সূক্ষ্ম শিল্পের মোড়কে সুসংস্কৃত করার নামে কলকাতার থিয়েটার আদর্শবাদ বর্জন করল। বুদ্ধিদীপ্ততার নামে বেশ কয়েক দশক নানা কসরৎ দেখাবার পর এখন শুরু হয়েছে জন মনোরঞ্জনের পালা। এদের বিচারে গিরিশ ঘোষ, উৎপল দত্ত, গণনাট্যের নাটক মূল্যহীন। উৎপল দত্তের প্রযোজনার বিশ্বস্বত্ব স্বীকার করলেও তাঁর রাজনৈতিক থিয়েটারের তত্ত্ব গ্রহণ করা হয় নি। বিজন ভট্টাচার্যকে করুণা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

পত্রিতাপের কথা বৃহৎ পুঁজি শাসিত সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকগুলোর মত লিটল ম্যাগাজিন ও বামপন্থীদের পরিচালিত মুখপত্রগুলোও ছোট নাটকের দলগুলো সম্পর্কে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ছোট নাটকের দল ও তাদের শিল্পীরা এদের কাছেও ত্রাত্য থেকেছে। বিকল্প সংস্কৃতির প্রচার করাই বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব দিতে এগিয়ে আসবেন।

কটি পত্রিকায় ছোট নাটক ছাপা হয়। ছোট নাটকের প্রযোজনা সম্বন্ধে নাট্য সমালোচনা প্রকাশ করা হয়? কটি পত্রিকা এই জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমটির খবর রাখেন? এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের মর্যাদাদান করেন? ছোট পত্রিকার সংগঠক, লেখক, কবিরা কি জানেন গৌতম মুখোপাধ্যায়, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, নন্দেন্দু সেন, সমীরণ আচার্যরা সাহিত্য শিল্পের পাঠক হিসাবে কতটা নিষ্ঠাবান। রাজ্য সরকার প্রতি বছর কিছু আর্থিক সাহায্যও একটি পুরস্কার দিয়ে দায়মুক্ত হন। এক ধরনের বিভেদ গৌতমদের ছোট প্রমাণ করার প্রয়াস সরকারীভাবেও প্রকট। সরকারী আয়োজনে সাংস্কৃতিক কর্মকিতে, সেমিনারে, নাট্য ওয়ার্কশপে ছোট নাটকের দলের শিল্পীরা ত্রাত্য।

সুদীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে দল পরিচালনা করছেন, নাট্য প্রযোজনায় আন্তরিক ও দক্ষতা দেখিয়ে চলেছেন এমন দলের ও ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। কলকাতায় ১/২টি নাটক অ্যাকাডেমীতে মঞ্চস্থ করে, ১/২টি সিনেমার পরিচালক হওয়ার সুবাদে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রচার ও মর্যাদা লাভ করেন কেউ কেউ। তাদের পাশে গৌতম, সুদীপ, সমীরণ, গোপাল দাসরা মর্যাদা পাবে না কোন যুক্তিতে? জনাপত এই অপমান ও গ্লানি গৌতমদের হৃত্ত স্তব্ধ করতে পারবে না। তবে নতুন গৌতমদের পদধ্বনি শোনা যাবে না অযোগ্যতায় হয়ে পড়বে বাংলার পদাতিক থিয়েটারের প্রাণ প্রবাহ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের অবশেষ প্রক্রিয়া। যেমনভাবে লোক শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দৌলতে। লোকশিল্পীরা আজ স্মরণার্থী।

এই লেখার স্বল্প পরিসরে একাঙ্কিক ও তার প্রযোজনার নাম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে চেষ্টা করা যাবে। গত দশ বছরে আমার দেখা কয়েকটি নাটকের উল্লেখ করব, পাঠক সুযোগ পেলে দেখে নিলে উপকৃত হবেন।

সৌভিক সাংস্কৃতিকচক্রের নাটক (দক্ষিণেশ্বর)—কেন না মানুষ, কমিটেড, না, সাইকেল। সাইফ থিয়েটার গ্রুপ (কোন্নগর) —ঠিকানা, অনিকেত, অপারেশন বাধারোল। ইউনিট মালঞ্চ (হালিশহর)—হনুমা কা বেটা, দাদনা, চরিত্র। সাধুখ (পানহাটী)—রশ্মি-মারা গেছে, যুযুধান, কালকূট, ল্যাংড়া ঘোড়া। মনন (বরানগর)—বিক্রম ও আলালের, নন্দিতামি। প্রত্নিকাল (সোদপুর)—শার্লেমাইন, মনবেত সওয়াল জবাব। পোস্টমর্টেম। নাট্যচক্র (কৃষ্ণনগর)—আসন্ন কুরারী, স্বপনলতা। অন্বেষণের (উলুবেড়িয়া)—সীমাবদ্ধ, সুখী পরিবার। প্রত্যাশার (কল্যাণী)—কালুনগরী। অভিনেয়র (বালী)—অধিকার, নটী। এরকম অসংখ্য দল ও তাদের শিল্পকর্ম নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা করা যায়।

জনৈক মার্কিন নাট্য-গবেষক এদেশে সাম্প্রতিক ভারতীয় থিয়েটার বিষয়ে গবেষণা করতে এসে বলেছিলেন, বাংলা থিয়েটারের মূলধারা হল এই একাঙ্কিক নাটকের দলগুলোর নাট্য প্রবাহ। বিষয়টি বিতর্কিত। তবুও বলা যায় ডাঃ নর্মান বেথুনের মত এরাই মানুষের জন্য মানুষী চিকিৎসার গ্রামেগঞ্জে হাসপাতাল নিয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছে যায়। এই সব বেয়ারফুট ডাক্তাররাই জাতীয় মেরুদণ্ড। পীড়িত মানবাত্মার চেতনার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো' বিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

জি জিয়ানলিন

মহান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীন দেশের পাঠকমহলে সুপরিচিত। প্রায় ৬০ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী চীন দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রায় সেই সময় থেকেই চীন দেশের লেখকবৃন্দের কাছে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে চীনদেশ ভ্রমণ করেন। জাপান যখন চীনের উপর তার জঘন্য আক্রমণ নামিয়ে আনে, রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে দ্বার্থহীন ভাষায় সেই আক্রমণকে নিন্দা করে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের লড়াইকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। চীন দেশের জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন সর্বজন প্রিয় বিদেশী লেখক ছিলেন না ; তিনি ছিলেন তাদের একজন পরম সুহৃদ। মানব জাতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবদান কত গভীর এবং কতদূর সুদূর প্রসারী ছিল, তার মূল্যায়ন এবং এইরূপ একজন নিকটতম বন্ধুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য, তার বিংশতিশততম জন্মদিবসে আমরা সমবেত হয়েছি।

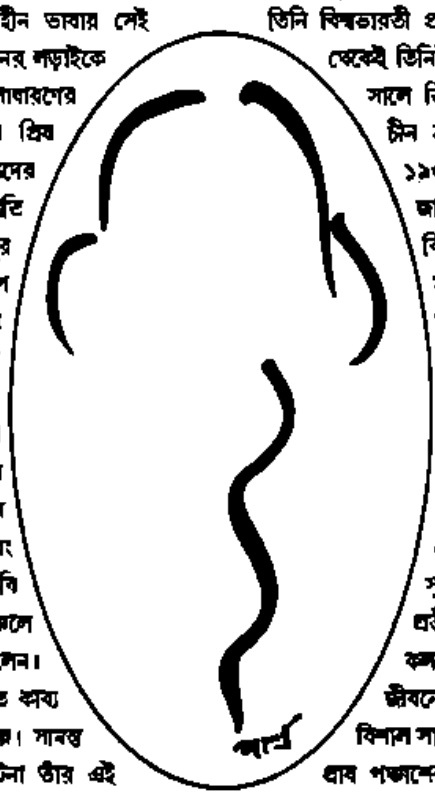

ভারতবর্ষে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকাশ লাভ করে। প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, সন্ন্যাসী এবং রাজা ও রাণী নাটক তাঁর প্রথম জীবনের কবি প্রতিভার স্বাক্ষর। পৈত্রিক জমিদারীর গ্রাম অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে বাস করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন "কথা" এবং কতকগুলি ছোট গল্প। সাধারণ জীবনযাত্রার করুণ ও মর্মস্পর্শী কতকগুলি ঘটনা তাঁর এই সময়ের রচনার মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিশুদের শিক্ষা নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। বিংশশতাব্দীর সূচনাতেই তিনি চোখের বালি (Eye Sore), নৌকাডুবি (The Wreck) এবং গোরা উপন্যাস লেখেন। ১৯০৫ সালে ভারত জাতীয় আন্দোলন তখন তুঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণকে জাতীয় বোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং গীতাঞ্জলী, শিশু (The Crescet Moon) মালিনী (The Gardener) এবং বলাকা (The Stray Birds) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই তিনি বেশ-কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি চীনে যান। সেখান থেকে ফিরেই তিনি চীন ভ্রমণ (Talks in China) প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সালে যখন ফাসিস্ট জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের আগ্রাসী আক্রমণে সারা পৃথিবী বিপর্যস্ত তখন তিনি বিচলিত বোধ করেন। এই সময়ের কয়েকটি গীতিকবিতা মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণ্য অত্যাচারে তাঁর নিন্দা ও ঘৃণা অসামান্য বলিষ্ঠতার রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট কলকাতায় তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

শিল্পজগতে রবীন্দ্রনাথ এক বহুমুখী প্রতিভা। কেবলমাত্র তিনি একজন প্রথিতযশা লেখক, কবি ও নাট্যকার ছিলেন না, চিত্র এবং সুরে তিনি ছিলেন সফলতার এক মূর্তিমান প্রতীক। সমস্ত জীবন জুড়েই রয়েছে তাঁর কলাসৃষ্টির নানান বৈচিত্র্য। ১৮৮০ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে ৬০ বছরের বিশাল সাহিত্যকীর্তি এবং উত্তরসূরীর জন্য রেখে গেছেন প্রায় পঞ্চাশের বেশি কাব্যগ্রন্থ, ১২টি উপন্যাস, শতাধিক ছোট গল্প, কুড়িটির বেশী নাটক, এবং সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ বিষয়ক নানাবিধ প্রবন্ধ এবং অসংখ্য চিঠিপত্র। তাঁর বিশাল গ্রন্থাবলী শুধুমাত্র ভারতের মানুষের নিকট এক অমূল্য সামগ্রী নয়, সারা বিশ্বসাহিত্যেও এক মূর্তিমান ঐশ্বর্য।

বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনে পরাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন। মাতৃভূমির পরাধীনতা, জাতীয়জীবনে অবমাননা এবং

উপনিবেশ শোষণ তাঁর সাহিত্য প্রতিভার শুরুতেই তাঁকে রাজনৈতিকতার স্বাদ এনে দিয়েছিল। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণ প্রথম জীবনের রচনা 'কথা' কাব্যগ্রন্থ ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিদেশ পুরুষদের কাহিনী চিত্রণের মধ্যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা ও ক্ষমাঘাত প্রকাশ পেয়েছে। (গোবিন্দ সিংহ)। প্রতিশোধ প্রবৃত্তির মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'শেষ শিক্ষা' রচনায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সহসন্ত উল্লেখ পাওয়া যায় যখন তিনি কল্পনা করলেন বিবাহ বাসরের আসরও যুবকটির প্রলুব্ধ করতে পারল না যখন যুদ্ধের রণধ্বনি আকাশ বাতাসকে ঘিরে রেখেছিল।

তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প উপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণাকে মূল্য প্রতিপাদ্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিদেশী পণ্য বিদেশ থেকে মেশে আমদানী করার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে প্রচণ্ড দেউলিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পণ রক্ষা (Promise kept) গল্পে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি 'মেঘ ও রৌদ্র' (The Sun and the Cloud) গল্পে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের জঘন্যতম এক নিদর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন। শশীভূষণ একজন আদর্শবান কলেজের ছাত্র। তার আদর্শ বিবর্ণ হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটল এবং মংস্যজীবিদের প্রতি বিদেশী উপনিবেশকদের উপর অকল্পনীয় অত্যাচার দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েও হতাশায় আক্ষেপ করতে হল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমরা কৌতুকের জন্য মৎস্যজীবির যে ক্ষতি হল ইংরেজদিগকে নিশ্চয়ই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কারণ সে ভারতীয়দের মানুষ হিসেবে মনে করে না। ঐ ভারতীয়রা মাছ ধরার নৌকা হারিয়েছে হয়ত তারা তাদের জীবনকেও হারাতে পারে।"

১৯০১ সালে গোরা প্রকাশিত হয় এবং এই সময় তার স্বদেশীকতা বোধ এক নতুন দিগন্তে পৌঁছয়। গোরা উপন্যাসে মূল চরিত্রে গোরাকে স্বদেশপ্রীতির এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোরার বক্তব্যের মধ্যে তিনি বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে নিজেকে সোচ্চার করেন। বিখ্যাত অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ দেশগুলির মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে ধারা সুপ্ত প্রবাহের মত এগিয়ে চলছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপন্যাসে সেই দিকটার প্রতি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ দেশকে মুক্ত করবার সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হতে পারেননি তবুও তিনি বুঝেছিলেন যে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশকে দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং এর জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। সে সময়ে কিছু লোকের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ; তিনি এই ভ্রান্ত ধারণাকে লাঞ্ছন করেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত রচনাবলী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক বাস্তব নির্ভর তাৎপর্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ কখনও একজন সংকীর্ণচেতা স্বাদেশিক ছিলেন না। তাঁর স্বদেশপ্রীতি স্বদেশের সীমান ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের অপরমহলে প্রবেশ করেছিল, একথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। পরাধীনতার স্বদেশবাসীর যন্ত্রণা অনুভব করে অন্য পরাধীন দেশের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। ১৯০০ সালে যখন জার্মানি, ইটালি এবং জাপানের ফাসিস্ট গৌড়ামনব নানাদেশের উপর পদদলিত করে শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল কবি তখন শান্ত থাকতে পারেননি, এই সমস্ত ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে গর্জে উঠলেন। মিউনিক চুক্তি'র শূন্যতা ও অসারতাকে তিনি জগতের সামনে তুলে ধরলেন এবং অক্ষশক্তির দেশসমূহের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আক্রমনের বিপদের কথাও তুলে ধরে চীন যুদ্ধের জন্য জাপানকে সাবধানের হুঁশিয়ারী জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বিশ্বের দরবারে আবেদন তিনি নিয়ে দাঁড়ালেন। 'পৃথিবী থেকে ছেড়ে যাবার আগে আমি জনে জনে মিনতি করি, মানুষের আবরণে যে-ভয়াবহ দানব আছে, প্রস্তুত হও, তার বিরুদ্ধে লড়াই কর', (প্রান্তিক) এই সময়ে তিনি অনেকগুলি নীতিধর্মী রাজনৈতিক কবিতা লিখেছিলেন যেগুলি তাঁর দীর্ঘ সৃজন প্রতিভার এক উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর।

সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তাঁর কবিকীর্তির আর একটা বড় দিক। ভারত চীনের মত হাজার বছর সামন্তবাদের বেড়াজালে আবদ্ধ। ভারতকে দখল করে ইংরেজ উপনিবেশিকরা সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে তাদের উপনিবেশকে ভারতের মাটিতে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এই জন্যই, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামন্ত শোষণের অবসানের কাজে সজাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক রচনার মধ্যে সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। সামন্ত শোষণের ভয়ঙ্কর চেহারা তুলে ধরে সামন্তবাদের অসার মূল্যবোধ এবং সামন্তপ্রভু সৃষ্ট জাতিভেদ ও ধর্মের ভণ্ডামিকে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সামন্তবাদের যূপকাষ্ঠে যে নারীরা প্রতিনিয়ত তাদের জীবনকে বিসর্জন দিচ্ছে তাদের বেদনা, যন্ত্রণা ও নির্যাতন কবির কয়েকটি গল্পকে করুণরসে সিক্তিত করেছে। ছোট গল্প 'মণিহারা' (The Riverside Steps) সামন্ত ব্যবস্থায় বিবাহপ্রথায় নারীজীবনের অকল্পনীয় যন্ত্রণার এক অনুকল্প স্বাক্ষর। সামন্তবাদের আর এক নিদর্শন সতীদাহ প্রথা। 'মহামায়া' (Mahamaya) গল্পেও এই প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র কষাঘাত। প্রেমিকের কাছে প্রেম নিবেদন করা মহামায়ার অপরাধ এবং এর খেসারতে তাকে জোর করে এক কুড়োর সঙ্গে বিয়ে করতে হল। বিবাহের দ্বিতীয় দিনে মহামায়া স্বামী হারাল। এর পর তাকে তার পাষণ্ড ভাই তার মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ করতে বাধ্য করল। চিতার লেলিহান শিখা পুঞ্জিভূত মেঘের আকার নিয়ে চিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং বৃষ্টির জলে চিতার আগুন নিভে গেল। এই সুযোগে মরণপথ থেকে মুক্তি পেয়ে মেয়েটি আবার তার প্রেমিকের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু দাহ চিহ্নের কদর্যতা তার মুখের সৌন্দর্যকে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে এবং প্রেমিকের কাছে তার পরম আহুতি, মুখের অবগুণ্ঠন যেন সে

না খোলে। অনেক বৎসর অতিক্রান্ত। একদিন তার ঘুমন্তরাতে চাঁদের আলোতে প্রেমিকের চোখে তার বিভৎস মুখ ধরা পড়ল। আচমকা জেগে উঠে রাগেতে সে তাঁর প্রেমিককে ছেড়ে গেল আর কোনদিন ফিরে এল না। কল্পনাকে কি এক অপরূপ রঙে সাজিয়ে, কাহিনী এবং বর্ণনায় সুলক্ষিত এক মাধুর্যেতা পরিপূর্ণ করে সতীদাহ প্রথার বিভৎসতাকে উদঘাটন করে অসহায় ভাগ্যহীনা নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ছোট গল্পটিকে এক অনন্যের আসনে বসিয়েছেন। 'তাসের দেশ' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ কোন উপকথা কিম্বা বাস্তবতাকে নির্ভর করে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার কয়েকটি কুপ্রথার রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই সব রচনাতে নারী জাতির দুর্দশার প্রতি তাঁর সমবেদনা ও গভীর সহানুভূতি বারে বারে লক্ষ্য করা গেছে।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল গ্রামে বাস করেছিলেন। গ্রাম জীবনের দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতার সঙ্গে সেখানে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হল। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক এবং সামন্তান্ত্রিকতার যুগপৎ শোষণে নিষ্পেষিত লক্ষ লক্ষ কৃষকের মর্মবেদনায় আরও গভীরে প্রবেশ করলেন এবং ঐ সব হতভাগা কৃষকের প্রতি আরো বেশী সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দুই বিঘা জমি' (2 Bighas of Land) রচনা করেন। এই কবিতায় ঐ সমস্ত অত্যাচারী শোষকদের বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা লেখার হয়ে উঠেছিল এবং শোষিতদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি পূর্ববর্তী রচনাবলীতে তাঁর মানবিকতাকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমজীবি মানুষ যারা ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে এক গভীর জীবনবোধ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪১ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা "ওরা কাজ করে" তাঁর পক্ষে জীবন বোধের এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়—

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
কর্মধূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সঙ্কীর্ণ বাতায়নে।
জীবনে জীবন যোগ না
না হলে, কৃত্রিম পদ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
কবি জীবনের শেষ প্রান্তে উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রমজীবি মানুষই বিশ্বের চালিকাশক্তি এবং তাঁর এই উপলব্ধি এই সমস্ত কবিতার প্রতিটি ছত্রে অভিব্যক্তি হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি এমন কি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর রচনায় এই মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। 'ঐকতান' কবিতায় তাঁর এই ক্ষোভ আশা হয়ে প্রকাশ হল যে কৃষকদের মধ্য থেকেই সেই অনাগত কবির আবির্ভাব ঘটবে। এই উপলব্ধি অথবা দূরদৃষ্টি থেকেই কবি কবির বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

তাঁর কিছু রচনা যেমন হাড়কাঁপানো হাওয়ার মত শীতল অথবা প্রায় সূর্যতাপের মত তীব্র এবং শত্রুর প্রতি কষাঘাতও তীব্র, আবার অন্যদিকে কিছু রচনা শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত গভীর। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়, শিশু কাব্যগ্রন্থে, মালিনী এবং ঘরোয়ায় তাঁর রচনার এই সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের কবিতাগুলি গ্রামবাংলায় নির্জনে বসে লিখেছিলেন এবং প্রায় সব কবিতাগুলি কাব্যমাধুর্যে ভরপুর। কিছু কবিতা আবার সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ রচনাই অপাপবিদ্ধ, প্রাণস্পর্শক এবং মননশীল। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনায় কবি যেন এক নিপুণ চিত্রকরের মত গ্রামবাংলার নিখুঁত ছবি রেখাঙ্কনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছেন। কোথাও শরতের নীল নবঘন নির্মল গগনের ছবি, কোথাও বা বিচিত্র মুখরিত বর্ষামুখর রাত্রি, কোথাও নক্ষত্রখচিত আকাশ, কোথাও আষাঢ়ের নবমেঘের উষার আবাহন। তাঁর কবিতায় শান্তি সমাহিত ভাবের ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। তাই আমরা দেখি, কলসী ভাঁরে কন্যার জল আনা, তরুণী বধূর হাতে রূপার কাঁকন, গাছের ছায়ায় পরিশ্রান্ত কৃষকের বিশ্রামের পরিতৃপ্তি, গোধূলির পড়ন্ত বেলায় বালক রাখালদের গোবৎস ভাড়ানোর নয়ন মনোহর দৃশ্য। সরল সুন্দর ও সাবলীল ও ছন্দোবদ্ধ শৈলীতে রচনা এই কবিতাগুলি মানুষকে উদাস এক ভাবগম্ভীর সীমানাতে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও তিনি অনেক কবিতায় যৌবন ও প্রেমের জয়গান করেছেন। এই সব কবিতাগুলি নাড়া দেয়। বলাকা (Stray Birds) কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি ছোট ভাববাদী কবিতা নৈতিকতায় গভীর এবং মননশীলতায় সমৃদ্ধ। শিশু (The Crescent Moon) কাব্যগ্রন্থে রয়েছে আবার বেশ কিছু শিশুদের শ্রীতিধন্য বিসর্জন পরিচিত শিশু কবিতা। এই সমস্ত কবিতা পাঠেই যে কোন পাঠকই আবার তার ফেলে আসা শিশু অঙ্গনে ফিরে যেতে পারেন এবং সেই সমস্ত বিগত সুখী জীবনের স্মৃতি রোমন্থনে নিমগ্ন থাকেন। এই সমস্ত কবিতা সংকলন বহুল প্রচারিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

রচনাশৈলীর কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ও নিজস্ব রীতির কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে বলা চলে তাঁর রীতিটাই সম্পূর্ণ কাব্যধর্মী। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে কাব্যময়তা এত বেশী যে তাঁর বর্ণনাভঙ্গী, গীতিময়তা, মতাদর্শতা, ছান্দসিকতা চিত্রময়তা সব কিছু মিলে তাঁর কাব্য গীতিরসে অপরূপ। তার উপন্যাস এবং ছোটগল্প সমগ্র ভাবপ্রকাশের অপরূপ নিকনে, রচনার দৃশ্য বর্ণনায়, গীতিময় ধ্বনিতে, ছন্দোময় ভাষা বিন্যাসে, নিখুঁত উপস্থাপনায় এবং সুন্দর ও সাবলীল গল্প বলার মুন্সিয়ানায়

গীতিকাব্যের মাধুর্যে উন্নীত করেছে। তাঁর গীতিকবিতাসমূহ তাঁর গভীর দার্শনিক বোধে ভাবসমৃদ্ধ। শিল্পীর আঁকা জলরঙা উজ্জ্বল ছবির মত তাঁর দৃশ্য বর্ণনা স্বচ্ছ, নয়নমনোহর এবং চিত্তরঞ্জন। তাঁর অমর নাট্যগ্রন্থাবলির মধ্যে কয়েকটি গীতিনাট্য পদ্যছন্দে রচিত। কবি তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলীকে আরও উন্নত করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছিলেন। জন্মগত এই সমস্ত রচনা কুশলতা ছাড়াও তিনি ভারতের জাতীয় কৃষ্টিধারাকে অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রাখার প্রয়াসে আজন্ম প্রাণপাত করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ এক মহৎ যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুদীর্ঘ জীবন ধরে কবি তাঁর শক্তিশালী লেখনীস্পর্শে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ যুগের প্রতিটি ছবিতে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। ভারতে সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধিতা তাঁর চিন্তাভাবনা ও রচনায় রয়েছে সুন্দর প্রতিফলন। পাশ্চাত্যের দিকে না তাকিয়ে তিনি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন।

সু সুন কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি তাঁর "নির্বাক চীন" প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছেন, "বিশ্বকবিকে বাদ দিয়ে ভারতের কথা কি ভাবা যায়?" মানুষ হিসেবে কবি ছিলেন মহান এবং নৃত্যঞ্জয়। ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সংগ্রামী কণ্ঠস্বরকে তিনি বাকময় করেছিলেন এবং সুখী সমৃদ্ধ জীবনের পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

উপসংহারে আমাদের দেশের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতার কথা আমি বলতে চাই। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় চীনকে ভালবেসেছিলেন। তিনি চৈনিক সংস্কৃতির প্রতি প্রশংসা জানিয়েছিলেন এবং চীন জনসাধারণের জীবন ও অবস্থার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি আমাদের দেশে আফিম রপ্তানীর জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে তেজস্ব ঘোষণা করেছিলেন এবং শোষিত চীনাদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি ভবিষ্যতবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যদি চীনের সামনে দুর্বার শক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সৃষ্টি হয় তাহলে চীনের অগ্রগতির সামনে পৃথিবীর কোন শক্তিই অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। চীনের ছাত্রদের সামনে এক বক্তৃতা সভায় তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে চীনের ভবিষ্যত এক বিরাট সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং চীনের ভবিষ্যত সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যতের সমার্থক। তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যে দিন চীন সমৃদ্ধশালী হবে এবং চীন-ভারতের ঐতিহ্যবাহী মৈত্রীকে লালন করে এবং বন্ধুত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে দুই মহান দেশ এক নতুন এশিয়া সৃষ্টির কাজে এগিয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন যে "চীন ও ভারতের এই ঐক্য ও বন্ধুত্ব সংগ্রামী এশিয়ার ভিত্তিস্থল এবং আমাদের মিলনের পথে কণ্টকাকীর্ণ হলেও নূন পথের সন্ধান পেতে তেমন কিছু বেগ পেতে হবে না।" আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্বকবির ঐকান্তিক এবং বিশাল প্রচেষ্টা আমরা কোন দিনই বিস্মৃত হব না।

আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ উৎসব উদযাপন করেছি। আজ আবার আমরা এই মহান ভারতীয় লেখকের ১২০তম জন্মজয়ন্তী পালনের জন্য মিলিত হয়েছি। এই ঘটনা থেকে এটাই কি প্রতীয়মান হয় না যে চীনের জনগণ ভারতের মানুষকে ভালবাসে, তাদের উজ্জ্বল সংস্কৃতির পূজারী এবং দুই দেশের মিলিত বন্ধুত্ব কামনা করে?

আমরা এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত যে চীন-ভারতের বন্ধুত্বের ধারা হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে বহমান, সীমাহীন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে প্রবাহিত হবে।

ভাষান্তর (ইংরাজী অনুবাদ থেকে) শংকর মুখোপাধ্যায়

সদ্য চীন প্রত্যাগত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রদ্ধেয় জননেতা বিধায়ক বরেণ বসু আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে গ্রামোন্নয়নের তথা পৌর-নগরোন্নয়নের যে সরকারি দায় তিনি আমৃত্যু কৃতকার্যতার সঙ্গে পালন করেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমরা বিশ্বাস করি শ্রদ্ধেয় বসু, তাঁর আমৃত্যু কর্মোদ্যোগ সেবাধর্মের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা তাঁর আরব্ধ কাজ অব্যাহত রাখার শপথ নিচ্ছি।

মধ্যমগ্রাম পৌরসভা

মধ্যমগ্রাম ২৪ পরগনা (উ)

ক্রান্তিক

মাসিক সাহিত্য সঙ্কলন

২৫ বর্ষ, আগস্ট ১৯৯৮

পত্রিকা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা

কবিতা মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

অমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ সান্যাল,
পরেশ ধর, উমেশ চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাস, বিশ্বু সান্যাল, কেতকীবন চক্রবর্তী

সভাপতিমণ্ডলী

শর্মা মুখ্য, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষ,
প্রকাশ মিত্র, শুভব্রত ভট্টাচার্য

সম্পাদক

সুব্রত চক্রবর্তী, অনির্বাণ ঘোষ

নির্বাহী সম্পাদক

তাপস মুখোপাধ্যায়

সহযুক্ত সম্পাদক

অজয় কুমার নন্দী, অমিত ভট্টাচার্য, প্রদীপ সেন, তাপস রায়

সহ-সম্পাদক

লাবু ঘোষ, অমিত বেরা

সভাপতি

মিলন দাস

সম্পাদক মণ্ডলী

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সরকার,
অমলেন্দু মাইতী, কল্যাণ আচার্য, কবিতা মুখোপাধ্যায়,
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিমেষ টাল হক, মুহম্মদ আহসান
সমীর ঘোষ, মোহন নন্দর, মনোরঞ্জন পুরকাইত,
রমেন ভট্টাচার্য, গৌতম বে, প্রবীর মুখোপাধ্যায়,
তন্ময় ঘোষ, নিত্যানন্দ মণ্ডল।

কর্মাধ্যক্ষ

গোপাল পাল

মন্ত্রক সম্পাদক ▫ রতন চট্টোপাধ্যায়
সহকারী মন্ত্রক সম্পাদক ▫ অনিরুদ্ধ সেন
অর্থ সচিব ▫ নিত্যানন্দ দাস
বিজ্ঞাপন সচিব ▫ গীতা মিত্র, অমল দাস
প্রচার সচিব ▫ তপন কুমার বিশ্বাস
প্রকাশনা সচিব ▫ উজ্জ্বল চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ ▫ অহর দাশগুপ্ত
অলঙ্করণ ▫ প্রবীর সরকার, সঞ্জীব তপ, পার্থ মিত্র

প্রচ্ছদ শিল্প ও শিল্পী

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'অন্ধকার আঁধার এক' কবিতায় লিখেছেন- "...মনের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি / এখনো মনের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় / মহৎ সত্তা বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা / শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।" কালবেলায় বর্তমান পৃথিবীতে চারিদিকে শুধু বিকৃত ক্ষমতার লড়াই, মানুষে মানুষে হানাহানি, ধর্ম আর জাতের নামে অধর্ম আর বজ্জাতি। ধনিয়া আর জোতদারদের পৃথিবীপনা পরাক্রম। শিক্ষিত ভদ্র-সভ্য মানুষেরা আজ ত্রাস্ত, মিডিয়ার এক বড় অংশে পাশ্চাত্যের অশালীন নগ্নতাকে সংস্কৃতির মোড়কে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে চলেছে। এই অ-সভ্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চেতনার উন্মেষ। শিক্ষা আনে চেতনা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তারও সুস্থ বিকাশ। আজ মানুষের বাঁচার লড়াই অশিক্ষা, কুসংস্কার, অর্থনৈতিক-শোষণ, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। লড়াই-এ তাঁর প্রাথমিক প্রয়োজন যেমন চেতনার বিকাশের জন্য শিক্ষা তেমনি, শারীরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য হাতিয়ার।

শিল্পী অহর দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদের ছবিতে দেখি একটি বাড়ির চালে বসা কুৎসিত শকুন। দেশ ও সমাজের উপর অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সর্বগ্রাসী লোভের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। দু'পাশে চারটি মুষ্টিবদ্ধ হাত, যেন অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণ, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উন্মেষ মুক্ত প্রতিবাদের প্রতীক। চেতনার উন্মেষ আর অন্যায়ের প্রতিরোধে সভ্যতার মৃতের হাতে বই আর রাইফেল। গণআন্দোলনের ক্ষমতা অসীম। নিমেষে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম সমস্ত অসভ্য বিকৃতিকে। ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে সমস্ত বাধা-বিপত্তির জগদ্দল পাথর। অহর দাশগুপ্তের এই ছবি এই সময়ের সমস্যাগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

শিল্পীর প্রকৃত পরিচয় তাঁর শিল্পকর্মে, তার সৃষ্টির সার্থকতায়। অহর দাশগুপ্ত শিল্পী হিসেবে কত বড় মাপের তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তুলির সাবলীল চলন আর রেখার বলিষ্ঠ ব্যবহারের এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর এই ছবিতে। একই সাথে বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনকে বাদ দিয়ে, সমাজ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করে আঁকা ছবি জনমানসে কোনো ছাপ ফেলতে পারে না। শিল্পী অহর দাশগুপ্তের ছবিতে তাঁর জীবনবোধের মহত্তর এক চেতনার সাথে তাঁর আত্মিক সম্প্রীতির খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে একদিকে যেমন তাঁর সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেরকমই তাঁর ঘরানা এবং বাধনের উপর দখলেরও অভ্রান্ত স্বাক্ষর মেলে। ক্রান্তিক পত্রিকার প্রচ্ছদ বরাবরই চিন্তার খোরাক যোগায় মনোযোগী পাঠককে; এই প্রচ্ছদ চিত্রটি তো রীতিমত সমৃদ্ধ।

সুব্রত চক্রবর্তী

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ.—D.O. No.—1578
Dt. 5.5.'98

With best compliments from :

Y I T Company

(Young India Typewriter Co.)
39/4, Deshpran Sasmal Road,
Howrah - 711101
Phone : 68-9289

Typewriter, Duplicator
&
Calculator

Sale, Service & Repair
Govt. Contractor

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র

আলোর ফুলকি

মাসিক শিশু সাহিত্য পত্রিকা
প্রকাশিত হবে।

এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন :

ক্রান্তিক প্রকাশনী
স্টল—৩১, ব্লক—এ
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

With best compliments from :

UPAVAN CENTRE

4005914

Ashok Bhawalka

SPACE
DONATED
BY

Glaxo Calcutta Employees' Co-operative Credit Society Limited

50, Hide Road, Calcutta-700 088

(Regd. No. 96/Cal of 1964)

With best compliments from :

SEARCHERS (INDIA)

Phase : II / E - 83A, Industrial Area
Bokaro Steel City - 827014

BST BK - (R) Dt. 16-1-85 06542-40014 (O)
CST BK-1125 (C) Dt. 6-9-86 Ph 91-06542-40471 Fax (R)
06542-48475 (Works)

With best compliments from :

Kharagpur Metal Reforming Industries Pvt. Ltd

Manufacturers of :
S. G. Iron, Greaded Cast Iron, Plain Carbon & Alloy Steel, Casting Specialist, Mechanical Spares & Components.

Koushallya, Kharagpur-721 301

City Office : Hind Apartment (3rd Floor)
545, G. T. Road (South), Howrah-711101
Gram : Manjyoty Kharagpur

City Office : 660-1651, 660-1283
Works : IIWH-660-1614
Works : KGP-03222-55340

Phone : Fax : Office : 033-660-2452.
Works : 03222-55376

With best compliments from :

SEARCHERS (INDIA)

72, Co-operative Colony
Bokaro Steel City - 827001
Dist - Bokaro

Phone : (06542) 40014 (O), 40471 (R)

With Best Compliments of

Mrinal Kanti Sircar

BHARAT STATIONERS

Dealers in Educational & Office Requisites
From and Registers of Schools, Colleges,
Co-operative Societies, Panchayats,
Public Libraries and other Institutions.

15, College Square, Calcutta-700 073

শুধু ঘর নয়, ঘরের সাজসজ্জাই আসল

রুচিসম্মত ফার্ণিচার (কাঠ ও স্টীল)
পরিবেশনায়

শ্রী বিষ্ণু ফার্ণিচার

১ নং রেলগেট যশোহর রোড
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

Space donated by

A
Well
Wisher

আমি মাসিক "ক্রান্তিক"-এর গ্রাহক হতে চাই। বাষ্মাসিক / বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা হিসাবে পঞ্চাশ টাকা / একশ টাকা / আজীবন সদস্য হিসাবে এক হাজার টাকা এই সঙ্গে পাঠালাম। _____

মাস থেকে আমাকে বারটি সংখ্যার গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেবেন।

স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

পিনকোড

KRANTIK (MONTHLY) REG. 32755/78 PRICE RS. 8.00

Priya

NICE-T
BISCUITS

মেরী পসন্দ
কি তো
বাতই কুছ
আওর হ্যায়

EYE LEVEL